ISSN : 2347-6621
সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক পত্রিকা
ত্রয়োদশ বর্ষ, শরৎ-হেমন্ত সংখ্যা, ১৪২৬
সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯
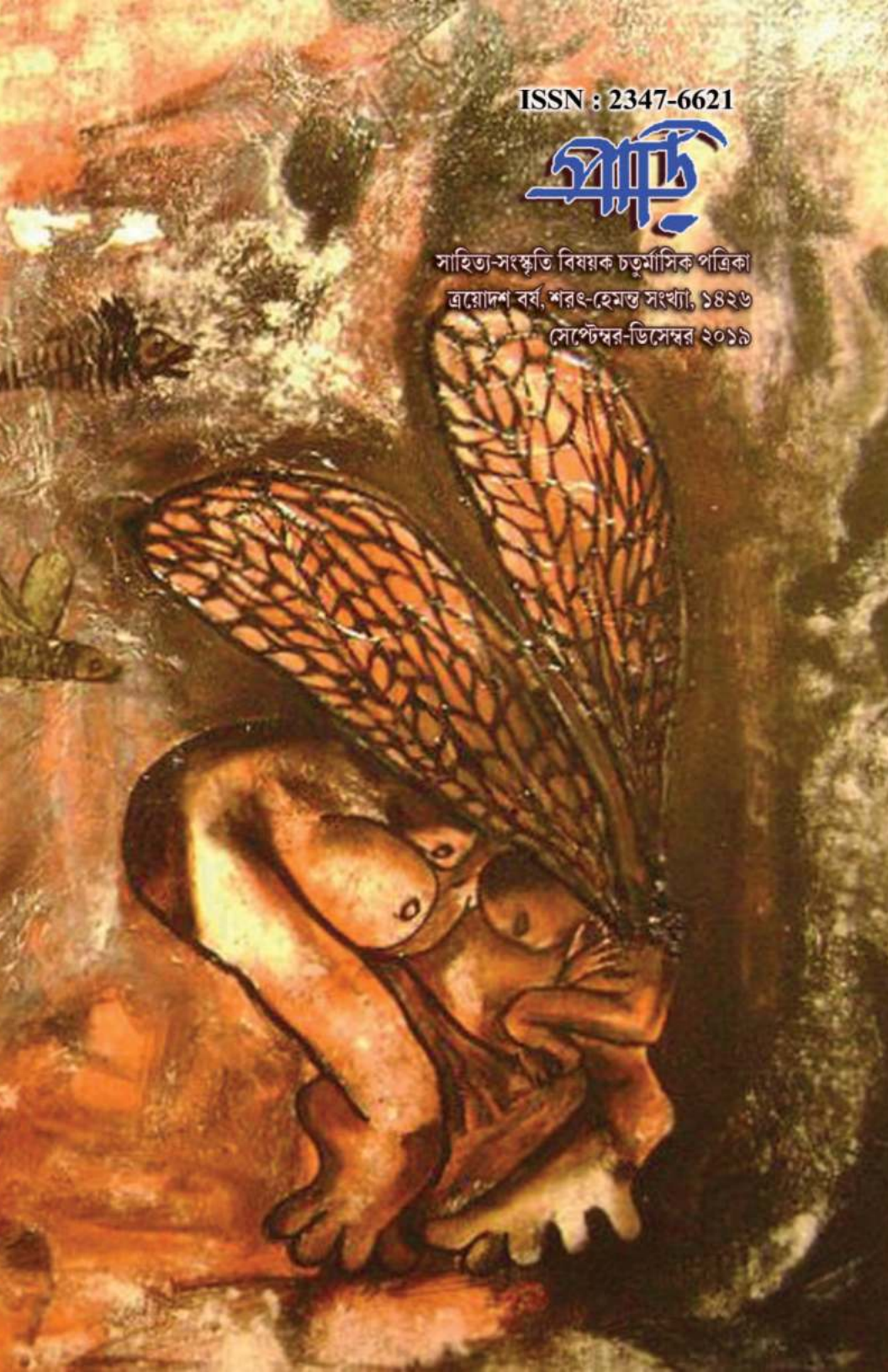
ISSN: 2347-6621

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োদশ বর্ষ, শরৎ-হেমন্ত সংখ্যা, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর ২০১৯

PADI
A Triannual Bengali Magazine of Literature and Culture
September-December 2019

সম্পাদক : চন্দন মিত্র

সম্পাদন-সহযোগী : দীপেন্দু হালদার, সুশান্ত দেবশর্মা, মানসকুমার হালদার, অনুপম পাত্র, অরূপ কয়াল, অমলেন্দুবিকাশ দাস, প্রবীরকুমার প্রামাণিক, অভীক হালদার, বিজন মিত্র, সুব্রত বায়েন, সুমন চক্রবর্তী, সৌগত পাহাড়ী, সৈকত ঘোষ, সাজিদুল ইসলাম, সমীর ঘোষ এবং লক্ষ্মী টি স্টল-এর বন্ধুরা।

প্রচ্ছদ : সাজিদুল ইসলাম

মুদ্রণ ও অক্ষরবিন্যাস : রিতিকা ডিটিপি সেন্টার
ফতেপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রাপ্তিস্থান : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট
বই ক্যাফে কলিকাতা
৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯
সুপ্রকাশ বইঘর, কলেজ স্কোয়ার, সূর্য সেন স্ট্রিট
অনলাইন বিপণি: thinkerslane.com
অশোক পুস্তকালয়, ডায়মন্ড হারবার
লক্ষ্মী টি স্টল, ডায়মন্ড হারবার

যোগাযোগ : চন্দন মিত্র
ভগবানপুর (হরিণডাঙা), ডায়মন্ড হারবার,
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, সূচক- ৭৪৩৩৩১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
চলভাষ – ৯৩৩২৩৫৮৭৪৭
বৈদ্যুতিন ডাক - mitrachandan59@gmail.com

বিনিময় : ষাট টাকা

ISSN : 2347-6621

পাড়ি

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োদশ বর্ষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শরৎ-হেমন্ত সংখ্যা

সূচিপত্র

আমাদের কথা

কবিতা : ৫ - ১৬

সৌরিন ভট্টাচার্য, তৈমুর খান, অরুণ পাঠক, অনুপম পাত্র, জগবন্ধু হালদার, অতনু টিকাইৎ, আনিসুর রহমান খান, জ্যোতির্ময় মুখার্জি, সুভাষ বিশ্বাস, মানসকুমার হালদার, লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল, শংকর দেবনাথ, প্রবীরকুমার প্রামাণিক

প্রবন্ধ :

রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' – শিশির দাস ১৭

হেমন্তসখা সুভাষ এবং অনুষঙ্গে জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা – অরবিন্দ পুরকাইত ২৫

বিস্মৃত বাঙালি: প্রকাশ কর্মকার – বিশ্বজিৎ সাহু ৩৩

কবিতা : ৩৮ - ৫৪

অভিষেক দত্ত, তমোঘ্ন সরকার, দীপায়ন সাহু, হরেকৃষ্ণ দে, গোবিন্দ মোদক, শ্রীপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, সুমিত মোদক, রাখী সরদার, বঙ্কিমকুমার বর্মন, পিন্টু পাল, সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ রায়, রাজদীপ ভট্টাচার্য, বিকাশ দাস, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, রাজীব পাল, গৌতমকুমার গুপ্ত, দীপশেখর চক্রবর্তী, রানা সরকার, ফিরোজ আখতার, কল্লোল সরকার, রাহুল ঘোষ, দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়, পাপিয়া চক্রবর্তী, পারমিতা ভট্টাচার্য, পল্লব গোস্বামী, খুরশিদ আলম, শান্তনব চৌধুরী, রুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ মান্না, চন্দন বাসুলী, আশীষ মাহাত, রূপক চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দুবিকাশ দাস

প্রবন্ধ :

'দ্য ডেথ অব দি অথর': সাহিত্য সমালোচনায় ফরাসি বিপ্লব – পাপড়ি মিত্র ৫৫

গড়িয়ে গেল যে চাকা সে কি আর ফেরে – প্রবীর মণ্ডল ৫৯

পৌষপরব বড়পরব – অরূপ শান্তিকারী ৬২

অণুগল্প: ৬৪ - ৭৬

সুদীপ ঘোষাল, শ্যামল সরকার, সুমন্ত কুণ্ডু, প্রকাশ কর, পাপিয়া মাণ্ডী, রবীন বসু, চিরঞ্জিত সাহা, কৃপাণ মৈত্র, সঞ্জয় গায়েন, শোভন মন্ডল, দীপককুমার মাইতি, নিরাশাহরণ নস্কর, সুমনকুমার নায়েক

কবিতা : ৭৭ - ৮১

উত্থানপদ বিজলী, সোমনাথ বেনিয়া, সঞ্জীব সেন, বিদ্যুৎ মিশ্র, সঙ্গীতা মাইতি, বিকাশরঞ্জন হালদার, শ্রী স্বেয়তী, রাবণ, জহর মিত্র, অনীশ খ্যাপা

অনুবাদ কবিতা : ৮২

বুলগেরিয়ান কবি রোমান কিসিওভ-এর একগুচ্ছ কবিতা – সৈকত ঘোষ

প্রবন্ধ : ৮৪

মগের মুলুক একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান অথবা বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গির যুগলবন্দি – চন্দন মিত্র

পুস্তক পর্যালোচনা: ৯৫

দক্ষএক প্রাবন্ধিকের আত্মপ্রকাশ – অরবিন্দ পুরকাইত

আমাদের কথা

আমাদের পাড়ি

পাঠকবন্ধু, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের পাড়ি জারি থাকছে। অর্থাৎ আমরা হাল ছাড়ছি না এত সহজে। হাল-বৈঠাই তো আমাদের হাতিয়ার। ফলে আমরা দূর দিগন্তের স্বপ্ন দেখতে পারি। আমরা জানি দুর্যোগে হাল ছেড়ে দিলে ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী। বরং শক্ত হাতে হাল ধরে লড়াই জিততে হয়। আমাদের স্বপ্নটাই সম্বল এটুকু হারালে আমরা আটকে যাব চোরাবালিতে। আমরা মানি প্রকৃত কেড়ুয়াল কখনও নৌকো ছাড়ে না ...

আমাদের দেশকাল ...

আমাদের সংগ্রামলব্ধ দানাগুলি খেয়ে যাচ্ছে ভাববাদী পাখিদের ঝাঁক। আমরা তাদের ওড়াব কী, রোমাঞ্চিত হচ্ছি, অন্দরে ক্ষরিত হচ্ছে আনন্দরস। আমরা কাণ্ডজ্ঞানহারা হয়ে তাকেই পরম বলে আবাহন করে আনছি, যাকে ভাঙাকুলো বাজিয়ে সভ্যসমাজের চৌহদ্দির বাইরে ফেলে আসতে হয়। এই শঙ্খলাগার মতো আমিত্বের ঘোর, জাতের ঘোর, ধর্মের ঘোর আমাদের ঘাড় ধরে আমাদেরই ভদ্রাসন থেকে নামিয়ে দিতে চলল বলে। আসলে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আত্মদীপ জ্বালানোর চকমকি; কুকাফ এক অন্ধকারে নিমজ্জনই হয়তো আমাদের ভবিতব্য। তাহলে আমাদের যত ঋক্থ অর্জন, আমাদের পূর্বজরা নিজেদের জীবন নিংড়ে যে-সকল মহার্ঘ নির্যাস আমাদের প্রযত্নে রেখে গেছেন, সেসব কী পথে পথে পড়ে থাকবে পিশাচের প্রসাধনী হয়ে! বোধহয় এতটা সহজ নয় সমীকরণ। আবহমান বাংলার পরতে পরতে যে সঞ্জীবনী গান-গল্প-গাথা, যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বারুদ ঠাসা আছে তা তো হস্তগত হবেই দুর্জয় সন্তানদের...

সৌরিন ভট্টাচার্য-র কবিতা
ঘরে ফেরার পথ হারিয়ে ফেলেছি

প্রতিদিন সন্ধ্যার আকাশে মিটমিটে তারাটি জ্বলে ওঠার পর
কেন জানিনা আমি হঠাৎই ঘরে ফেরার পথ হারিয়ে ফেলি,
অবাক, দিকভ্রান্ত আমি ঘরে ফেরার পথ হারিয়ে ফেলি।
ধুলোয় মিশতে থাকে অফিসব্যাগ, ছাতা, ঘর্মাক্ত আস্তিন,
লালবাতি সরিষার খেতে মুখ লুকায়, থামে অগুনতি গাড়ি।
টুপটাপ স্মৃতিশিশিরে পিচ্ছিল হয় জানালার কালো গরাদ,
সন্তর্পণে নিজেকে খোয়াই সিনেম্যাটোগ্রাফিক ধূসর সাগরে।
নিখুঁত জ্যামিতিক আকারে প্রকট হয় বিষণ্ন সময়বেদি,
অন্তহীন হাহাকারে নিমেষে তলিয়ে যায় সমগ্র পৃথিবী।
অবয়বহীন কঠিন ফলকে ক্রমে ক্রমে ফুটে ওঠে সহস্র নাম —
ইতিহাস যাদের মনে রাখেনি — মুচি, কামার, কৃষক, শবর।
আমার হাতের মুঠোয় এখন আকাশটা মিলিয়ে যেতে থাকে,
অলৌকিক আলোর বলয়ে নিজেকে হারাতে হারাতে ভাবি —
এই বিশ্ব আমার ঘর; তবু আমি ঘরে ফেরার পথ হারিয়ে ফেলেছি।

এপিডার্মোডিসপ্লেসিয়া ভেরাসিফর্মিস

আমার খুব দম আটকে আসছে মা
আমায় কেন তুমি বাইরে যেতে দাওনা?
রোদে আমার ছাল পুড়বে বলে?
বৃষ্টিতে ভিজে মুকুল আসবে বলে?
একপাল হাওয়ায় পাতাগুলো উড়বে বলে?
ওই দ্যাখো ইস্কুলে যাওয়া ছেলেমেয়েগুলো
কী সুন্দর সারি বেঁধে হেঁটে যাচ্ছে
আমি কি ওদের সাথে হাঁটতে পারব না?
আজ নাকি অরণ্য সপ্তাহ পালন হবে,
মাস্টারমশাই দিদিমণিরা গাছ পুঁতবেন,
আমিও কেন একটা ছোট্ট বীজ নেব না?
কতদিন হল বন্ধুদের সাথে খেলি না,
বটগাছের শেকড়ের টান আমার শিরায়,
মা আজ আমি বেরোবোই, বাধা দিও না,
আমার ভেতরের অরণ্য আজ উন্মোচিত হবে,
আমার হাতদুটো সেই কবে গাছ হয়ে গেছে।

তৈমুর খান-এর কবিতা

আমাদের জমি

ধানগাছের মতো জন্মাতে চাই মাটিতে
ঘাসের মতন অবাধ
এখানে পাথর কেন রাখো?
এখানে মাটির স্পন্দন শোনা যায়

নিরীহ এবং সহ্যের সীমানা দিয়ে মোড়া
এ প্রান্তর রচনা
অনেক বিকেল, পাখির ঝাঁক, বর্ষার মেঘের গম্ভীরা . . .
এখানে ঈশ্বর নামেন, চাষার ঈশ্বর —
এখানে কেউ পাপ রেখে যেয়ো না!

বই

আর একবার আমাকে পড়ে নাও
প্রথম প্রেমিকার হাতে কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছি
প্রচ্ছদে লেগেছে ধুলোবালি
দ্বিতীয় প্রেমিকা পাতা ছিঁড়ে পরীক্ষা দিয়েছে
ভেতরে ভেতরে অজস্র দাগাদাগি
তৃতীয় প্রেমিকার কাছে প্রায় পরিত্যক্ত
হৃদয়ে-পাঁজরে কালি ফেলে গেছে
তুমি তো বিবাহিতা বউ
আমাকে বারবার পড়ো . . .

ঘুম

রঙিন আকাশে ছেঁড়া ঘুম ওড়ে
আমি ভাবি ঘুড়ি;
কাদের এত জাগরণ?
নিশ্বাস ভারি হয়ে আসে
সভ্যতায় ভরে ওঠে
নিঃসঙ্গদের বাড়ি।

অরুণ পাঠক-এর কবিতা

জীবন

আমার কাছেই কোনো আগুন রয়েছে
আরও আছে চাতুর্য মেশানো কিছু ধাতু
বিহ্বল, অন্তরঙ্গ আলো, তফাতে বিষাদ
মনে মনে আশ্চর্য হই, আসলে আমি কি?

রূপের তামাশা দিয়ে মুড়ে রাখা এই জল
অথচ ভঙ্গুর জীবন কত পরিবর্তনীয়
কিছু কি আকাশ ঢাকা উপুড় দোয়াত থেকে পাওয়া?
আমার বিনম্র স্বপ্ন মাঝরাতে আবিষ্কার করে!

আরও কিছু নারী, নিমগ্ন ঝুলনে গান গায়
স্বাভাবিক, তবু এই প্রথা চির কলঙ্কের
লেখায়-রেখায় এই আশ্চর্যময়ীরা এমন কি প্রাণ
আনে, যা আগুন সংরক্ষিতকরে রাখে?
জীবন তো খুব বেশি নষ্টই হয়, তবু তার
সামান্য কিনারা যদি কারও ভগবৎ হয়!

বীরত্ব

বাহুতে বীরত্ব ভালো নয়, মনেরও বীরত্ব আছে
সেই প্রভু, যিনি দীন; অন্তরে নিঃস্ব না হলে
জগৎ কীভাবে এসে ঢোকে, ভালোবাসা
অনন্তকে বোঝে, সেখানে প্রণত হয় ভস্ম ও ভূপতি
ইতিহাস জানে সব, ততক্ষণে রক্তও বয়ে যায়
গঙ্গা-শতদ্রুতে, ভালো না-থাকার এত গল্প
মানুষের মহিমা চেনায়। আমাদের পারঙ্গম খুঁটি
মঙ্গলের অধিবাসে নিঃস্তব্ধ দাঁড়ায়, সেই মন
জড় চায় আত্মার কাছে — আমিতে জড়ত্ব আছে
সেখানে নির্দয় শুকনো বহা খাত, জলের চঞ্চল নয়
বিবেক-মৎস্যের গতি স্থির হয়ে আছে স্বপ্নবৎ
ভূমিতে আপন খেলা হ্লাদ কাটে বাহুর মতন
সেই স্পর্শী, যার কোনো অস্ত্র নেই, অভিমানও নেই।

অনুপম পাত্র-র কবিতা

দ্বিধা

আকাশে পুণর্ভবা মেঘ। অথচ ঠিক এখুনি বৃষ্টি চাইছি না আমি। উপশমের জন্য সময়কে ছেড়ে দিয়েছি একটি মুক্ত অবকাশ। সেই অবকাশের মধ্যে ঢুকে পড়ল আমাদের ঘরের মধ্যে, অজগরের ফাটল। সে সমস্ত ভয়ানক সাপ আমরাই ছেড়ে রেখেছি আমাদের শহর জুড়ে, তারা আজ সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে নাড়া দিয়ে যায়। যন্ত্রণার পুনর্বাসন হয় না। তবু আমরা মেপে দিচ্ছি সমস্ত ভাঙনের তুল্যমূল্য, সমস্ত স্মৃতির আকাশ ঢেকে দেওয়ার জন্য নতুন বহুতল।

মেঘ এসে বৃষ্টি দিতে চায়। আর আমি ভয়ে মেঘদূত লুকিয়ে রেখে বালিশের নীচে, বারান্দায় এসে দেখি জলতল কতখানি নেমে গেছে আজ, কতখানি বৃষ্টি নিলে এখনও আমাদের পায়ে-হাঁটা পথ নাব্যতা পাবে। অজগর যে পথে চলে যাবে রোজ, সেখানে মিনার তুলে আমরা ছুয়েছি আকাশ, পেতে দিয়েছি ব্যস্ত জীবনের পাটাতন, সেখানে ও মেঘ এসে উঁকি দিয়ে যায়। আমি ভয়ে চলে আসি ঘরের ভিতর, আয়নাতে চেয়ে দেখি বিস্ময়ে; পর্বত না মূষিক, কিছুতেই চিনতে পারি না প্রতিবিম্বকে। উপশমের জন্য যে বরাদ্দ বৃষ্টি ছিল, তাকে রোজ এভাবেই হারিয়ে ফেলেছি আমি। জানি, আমাকেই একদিন নেমে যেতে হবে পথে, সমুদ্র দ্বিধা হলে মেনে নিতে হবে সমস্ত অনুশাসন।

অচল সময়ের কবিতা

অফুরন্ত সময়।
যন্ত্রণাকে দাঁতে পিষে আমি শিখে নিয়েছি কীভাবে ওড়াতে হবে ভেঙে পড়া সমস্ত অচল ঢেউ। কীভাবে হারিয়ে যেতে হয়, তীব্র অচলতায় ... সে তো শিখে নিলাম। জানি, আছড়ে পড়লে হঠাৎ তথ্যের ঝোড়ো হাওয়া, তুমি পাঠিয়ে, ফেলতেই পারো এক আকাশ করুণ কিরণ। করুণা মাখি না আমি। আমি বরং সমগ্র কোয়ার্কতন্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়াই। উপরে ও নীচে। আসলে, স্বপ্নে রোজ ভিজে যাচ্ছে খয়েরি রক্তে, আমার নভোচরীয় পোষাক। ভেঙে যাচ্ছে স্বপ্ন, ঠিক মাঝখানে এসে।

একটি নরম অবতরণ হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে রোজ। সমস্ত ইন্দ্রিয় সুইচ অফ করে কীভাবে মিশে যাওয়া যায় স্পেসে কীভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হয় সমস্ত পার্থিব সংযোগ, সে-সব শিখিয়ে দিয়েছে তোমার কলঙ্ক দাগ। আমাদের হাইওয়ে জুড়ে ভেসে আছে তাই এতো ফুটিফাটা অমোঘ সংকেত! এত কাচের টুকরো, এত রক্ত!! এই, জনসমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জনের নীচে ডুবে থাকা এক বিজন স্বপ্নপুরীতে ভেসে ভেসে আমি চলেছি ...
জানি, তোমরা আকুল, দেখা করতে চাও অনেকেই। আসলে এখানে গ্রাভিটি এখন কম, আমি চাইলেই এক লাফে চলে যেতে পারি অন্য অন্ধকারে... অথবা, তুমি যেমনটি চাও!!!

জগবন্ধু হালদার-এর কবিতা

বরং ভালো

রাতারাতি বদল হওয়ার স্রোতে
তুমিও ডিঙি ভাসিয়ে কোনোমতে
হেলানো চেয়ারে এলিয়ে দিলে মাথা
সরু গলি, লালচে বিকেল পাতা।

জমে থাকা গল্পগুলো ক্রমে,
বেঘোর জ্বরে শুক্র থেকে সোমে
চেটে যাচ্ছে একই অন্ধকার —
পুরানো বালিশ সঙ্গে 'ছেঁড়াতার'।

সুতো এবং নিশান গেছে ছিঁড়ে,
ভালোবাসার বাসি কুসুম ঘিরে
সন্ধ্যা কাটে আপসে-আপশোশে
চোদ্দোবার বৃষ্টি নামে কোষে।

হয়তো তোমার নাভির চারিদিকে
চুপিসাড়ে স্বপ্ন হচ্ছে ফিকে,
মত্ত জোয়ার শ্রাবণ রাতে আসে
মাটি ভাঙে তীব্র জলোচ্ছ্বাসে।

বরং ভালো ঘুমের কাব্য শোনা
বরং ভালো নতুন কাঁথা বোনা,
তোমার খেতে এখন আষাঢ় কাল
আমি ঘেমে কাটছি নিজের খাল...

ছায়া এবং ...

একটা আধবুড়ো ছায়া আমাকে মাপে প্রতিদিন
আমার চলার পথের নাড়ি-নক্ষত্র চিনে
কাঁটা ও কাঁকর বেছায় অহর্নিশি টিকি ধরে টানে

ঘাড়ের ঘূর্ণন, শিরদাঁড়ার নতি বুঝে বাড়ে ও কমে
কলার তুলে আমাকে বোঝাতে চায় —
প্রতিফলন পারে সে

একটা আধবুড়ো ছায়া আমাকে প্রতিদিন মাপে
ল্যাজা থেকে করোটি হয়ে
রোজ রাতে শরীর চাটে, গন্ধ শোঁকে,
পাহারা দেয় খোলাপেটে কাক মুখ দেবে ভেবে
কখনও বারি ঢালে নুয়ে পড়া মূলে
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে লেপ্টে থাকে গোড়ালি ছুঁয়ে
জানলায় আলনায় অথবা খাটের ছতরি ধরে
চক্কর কাটে, হাঁপাতে হাঁপাতে হাসে

ছায়া কি বয়স্ক হলে খিটখিটে ও কামুক হয়ে ওঠে?

অতনু টিকাইৎ-এর কবিতা

কাঁধ

যে ছেলেটি এলোমেলো- অগোছোলা,
নিজের ভালো কম বোঝে

সবার মতো একইরকম হাঁটতে গিয়ে
হোঁচট খেয়ে 'আমি' খোঁজে,

তার একটা মানুষ লাগে
তার একটা কাঁধ লাগে।

ইচ্ছে

সব ধ্বংস হওয়ার আগে
একবার অন্তত উঠে দাঁড়াও
এখন মাথা নতর সময় না।

সব ধ্বংস হওয়ার আগে,
শেষবার বৃষ্টি আসুক অন্তত
ধুয়ে যাক শহর আবর্জনা

সব ধ্বংস হওয়ার আগে
পাখিটা খাঁচা ভাঙার সাহস পাক
স্বাধীনতায় মরুক অন্তত

আনিসুর রহমান খান-এর কবিতা

আরাধ্য অশ্রু - তেষট্টি

বন পেরোলে মাঠ। মাঠ পেরোলে ঘর। ঘরের ভেতর নিঝুম
নীরব কেউ। কেউ কী আছে মদের নেশায়! নেশায়-নাচে হচ্ছে
সম্মিলন। আলিঙ্গনের যজ্ঞে উন্মাদনা। টুপ গিলছে তিক্ত
বিষের ফণা। আমার তখন ইচ্ছেঘুড়ি কৌতূহলে ওড়ে। চলছে
ঠোকর ঠোঁটের আদর - বিশুদ্ধ পাগলামি দেখছি শুধু আমি।

আরাধ্য অশ্রু- চৌষট্টি

তোমার ঘরের ঠিকানা খুঁজে পাই বহুযুগ পর। আমি
স্বপ্নকানা — যুগান্ধ। কতবার গোপন খামে ফুলের বদলে
দিয়েছ পাপড়ি — ঠোঁটের প্রোট্রেট — প্রেম প্রজ্ঞা আহ্বান।
সেদিনের সেই বিকেলগুলো আজ বয়স্ক কাঁটাবন — তুচ্ছ
দূর থেকে অনুভব করি আঁধার অগ্নিসাক্ষী সর্বনাশের তরঙ্গ।

জ্যোতির্ময় মুখার্জি-র কবিতা

একটা হিলহিলে

অসুখে ধরেছে আমাকে
জানি, ভালোলাগায় কোনোও বাসি পাপ নেই
তবু ঘাম ছুঁয়ে উঠে আসছে জ্বর
শিরশির শরীর আড়ালে মধ্য তিরিশ
মেখে নেওয়া, আর যা কিছু ভুল
আগুন ঢেকো না বুকে

তিরতির ঠোঁটে, ঠোঁট ছোঁয়ালে
গলে যাব আমি।

ক্রমশ স্থির

হয়ে আসছে হাত
জলটুঙ্গির খুব কাছে একটা ঘর বানাব
সকাল বিকাল আসব যাব
বকের মতো মৃদু হয়ে দেখব জলের আনাগোনা

তারপর আস্তে আস্তে নেমে যাব জলে
এক কোমর, এক বুক, এক গলা
জল হলেই উঠে আসব ঘাটে

হাবুডুবু খেতে খেতে জলে তোলপাড়
তোলার কোনোও ইচ্ছেই নেই আমার
আমি ডুবতে চাই না, ভাসতেও
দূর-অভিমানে শুধু

কবিতা, তোমায় রাখব মুড়ে

সুভাষ বিশ্বাস-এর কবিতা

ঘর

জলের ধারে গাছ রয়েছে গাছের ওপর পাখি
সুখের ভিড়ে দুঃখ ওড়ে কোথায় তাকে রাখি

বনের ভিতর হিংস্র কূপ, কূপের জলে চাঁদ
চাঁদের গায়ে ক্ষুৎপিপাসার রোমাঞ্চকর খাদ

রাত্রি হলেই আলোর নিষাদ ফোটায় কুসুমহার
খাদের চোরা বালির মাঝে ঝুলন্ত সংসার ...

কথা

শরীর কিছু না জানালেও
 যেমন করে জানি
তোমার কাছে চেয়েছিলাম
 রোদের কাঁথাখানি
নদীর মতো টলোমলো
 তোমার চোখের পাতা
বুঝিয়ে দিল, অমোঘ ছিল
 জলের নীরবতা।

মানসকুমার হালদারের কবিতা

বেদনার ঘরে

অনুভবে যে আকাশ
বেদনার ঘরে গিয়ে রাত্রি ছুঁয়েছে;
তুমি তাকে ভালোবাসি বলে
এখনি অন্ধকার চেয়ো না —
তুমি বরং আকাশ চেয়ে দেখে নিও
ভালোবাসার নৈকট্য ছিঁড়ে
অন্ধকার তোমারও হয়তো
রাত্রি আলাদা দেখে মেঘ একদিন
তোমার দিকে ভেসে গেছে।

রাত্রির কাছে

ভালোবাসা আসলে কখনও
একটু বৃষ্টির জন্য —
তবু উদাসী হাওয়ার গভীরে
মেঘ ভেসে যেতে দেখে
রাত্রি কেন ছাড়ে না তাকে
হতে পারে নিঃসঙ্গ বেদনার জ্যোৎস্না ছুঁয়ে
কেউ হয়তো এখনও বলবে
তোমাকে ভালোবাসি শুধু
তোমাকেই ভালোবাসি।

আগুনের কাছে

আগুন জ্বালানো মানে
কাছে টেনে নেওয়া সেইসব
যতদূর আগুনও যেতে পারে না —
তবু তুমি গিয়েছিলে
আমার ঊর্ধ্ব বাহু ছিঁড়ে
শূন্যের ভেতর একাকী
আমাকে পুড়তে দেখে . . .

লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল-এর কবিতা

বিউগল - এক

শালুক থেকে পাখি ডাকগুলি অথই
আকাশে মিলিয়ে যেতে চায়, তার
ভেতরে নিঃসঙ্গ মেয়েটির কুঁড়েঘর —
ছোটো খেত আর কলমি ফুলের মালা নিয়ে
শীতলতা ছুঁয়ে দেয় দুপুরের মধ্যসুখে।

আমিও বিস্তর জলরঙের দিকে নিজের
গান গহ্বরে কেঁপে উঠি পূর্ণিমা মহিমায় —
খড়ি পড়া শিরদাঁড়ায় বিন্দু বিন্দু ঘামে
সূর্যের বৈভব নিয়ে দেখি — জল মিশে যায়
গভীর পাতালে সেই পাললিক আগুনে
আঁকড়ে ধরি মাটি —
আনন্দ আনন্দ

বিউগল - দুই

ওভাবে তাকিও না আর — আমার দিকের
কাঁপনগুলি চলে যাচ্ছে শীতের কিরণে,
মালতি পুকুরের টলটলে ঢেউয়ে হেলে
পড়েছে পাতাঘুঙুরের শোচনা, জানি ভেসে
যাবার টানে বাঁশি বাজিয়ে চলেছেন চাঁদ,
সাদা হাঁসের কথা মেনে নিয়ে আমি ফিরে
তাকিয়েছি পদ্মরানীর সাজানো পিপাসায় —
কেবল প্রার্থনার ঢঙে শিলাভূমির ভিতর
তিলতিল করে জমিয়ে রাখা মেঘসারি
মিশিয়ে দিচ্ছি একান্ত নির্ভরতায় —

ফুটে ওঠে সুন্দর সারা অঙ্গে মাখি অনুরাগ
পূর্ণজল

শংকর দেবনাথ-এর কবিতা

জীবন

বলাই যায় না
তবু দলা দলা কষ্টরা
দীর্ঘশ্বাস বেয়ে নেমে আসে

ঘেমে যায় ঘর-দোর-মন

তবু চোর চোর খেলি রোজ
খোঁজ করি একটা ভোরের

জীবনটা প্রেমের ঘোরের

ঘ্রাণ

কিছুই থাকে না
তবু বাঁকে বাঁকে পলি জমে
গড়ে ওঠে সমভূমি
ম্যানগ্রোভ বন
ধানখেত —

প্রেত এসে হেসে ওঠে
ভেসে যায় জরায়ুজ বীজ
তবু ধ্যানের মধ্যে জেগে থাকে চোখ
লেগে থাকে কিছু ঘ্রাণ —

প্রবীরকুমার প্রামাণিক-এর কবিতা

এসো

বাইরে এসে দাঁড়াও
দুহাত বাড়িয়ে ডাকো
হাজার হাতে

দেওয়ালগুলি ভেঙে দাও
জানালা দরজা ছাদ

রাস্তায় এসে দ্যাখো
অসীম আকাশ
খোলা
দিগন্তজোড়া মাঠ

সবুজ বনের পর সোনালি রোদ
নদীজল কলরব
সাদা কালো পীতাভের

আমার ডাঙা ভালোবাসার
ঘরহীন দোরহীন
শান্ত
সতৃষ্ণ - চাওয়া

এখন

চেনা ছন্দের ওপারে এখন রাত্রি
এপারে ঘুম-অন্ধকার

যে-আলোকে পথচলা এতকাল
তাও দিকশূন্য উলটপুরাণ

বীজ বুনে যাওয়া
বীজ বুনে যাওয়া
বুনে যাওয়া বীজ

রাত্রির কোলে মাথা রেখে
আলোকের খোঁজে সন্দিহান

কল্পনার রূপকথা শোনে
শিশুর মতো
এ বয়সে
বার্ধক্যের শৈশবে

অথচ ভিতরে তাকালে
অবিরত
উন্মোচিত আলোকমালা
ঝরনা হয়ে
নামত
শিকড়ে
আদুড় গায়ে।

রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম'

শিশির দাস

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত *মানুষের ধর্ম* পুস্তকের গ্রন্থপরিচয়-এ আছে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ১৯, ২১, ২৬ তারিখে অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে হিবার্ট বক্তৃতা দেন 'The Religion of Man'।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬, ১৮, ২০ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানুষের ধর্ম' 'কমলা বক্তৃতা' রূপে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত হয়।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৮, ৯, ১০ ডিসেম্বর অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজিতে বক্তৃতা দেন 'মানুষের ধর্ম'।

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে এতই মূল্যবান ছিল যে, ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা দেন। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা— ১০০।

এই গ্রন্থে আছে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা, তিনটি বক্তৃতা, পরিশিষ্ট মানবসত্য এবং গ্রন্থপরিচয়। গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, মানুষের আছে দুটো দিক, একদিকে সাংসারিক বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন জীব, স্বার্থপরতাই মানুষের জীবত্ব। গোটা বই জুড়ে জীবত্বের সঙ্গে পশুত্বের তুলনা করেছেন তিনি বারংবার। অন্যদিকে আছে স্বার্থকে অস্বীকার করে ত্যাগ ও তপস্যা (তপস্যা: আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কঠোর চেষ্টা)-র কথা।

মানুষের 'অন্তরে এমন একজন আছেন, যিনি মানব অথচ যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট': (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪/১৭) সর্বজনের হৃদয়ে আছেন। তিনি 'সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায়, ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। তাঁর উপলব্ধি তেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।' তিনি সমস্ত মানুষের অন্তরে আছেন, তাই তিনি সর্বজনীন মানুষ, তিনিই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম। 'সেই মানব, সেই দেবতা স একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি।'

[মন্তব্য – মানুষের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক নিয়েই রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি বক্তৃতায় আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মাতো জগতের সব কিছুর মধ্যেই আছেন, সমস্ত জীবের মধ্যে, সমস্ত পরমাণুর মধ্যেও আছেন, কিন্তু কবি এখানে মানুষের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্কের কথাই বলেছেন।

প্রসঙ্গত কয়েকটি শব্দের তাৎপর্য বুঝে নেওয়া যাক:

মন — চিত্ত, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, হৃদয়, অন্তর

ভাব— সত্তা, অস্তিত্ব, স্থিতি, মনের অবস্থা, চিন্তা, ভাবনা, মনস্থিত বিষয়, অভিপ্রায়

চিত্তবিকার — অনুরাগ, প্রণয়, ব্যাকরণের ক্রিয়া

ভূমা – বহুত্ব, প্রাচুর্য, বিরাট, সর্ব, সর্ব পূর্ণ

মানুষের ধর্ম, গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'ব্রহ্ম' অর্থে মানব- ব্রহ্ম, মহামানব, একঃ, যিনি, তিনি ইনি, সে, আদর্শ, ভূমা, ভগবান, পরম, সগুণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, মানব-পরমাত্মা, আত্মা, পূর্ণ, অসীম, সত্য, পরমপুরুষ, অন্তরতম, বিরাট পুরুষ, আনন্দময়, সর্বানুভূঃ, অন্তরঙ্গ সঙ্গী, স্রষ্টা, বিশ্বদেবতা, জীবনদেবতা, মনের মানুষ, সর্বজগদ্‌গত ভূমা, মহাপুরুষ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেছেন।]

বক্তৃতা-১ (সংক্ষেপে)

জীব 'দেহে দেহে স্বতন্ত্র, কিন্তু মনে মনে মিল পায়। জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে যতই সে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়, ততই সে কৃতার্থ (সিদ্ধকাম, চরিতার্থ, ধন্য) হয়। পারস্পরিক যোগের এই সম্পর্ক নিয়েই মানুষের সভ্যতা।'

'দেহের কোষগুলি স্বতন্ত্র, কিন্তু তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। যদি কোনোও কোষ স্বাতন্ত্র্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে,তাহলে হয় ক্যান্সার, যা সমগ্র শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।'

'মানুষের অন্তর সত্তার বোধ দৈহিক সত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে দেশে কালে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যের দিকে প্রসারিত। এই বোধেরই শেষ কথা হল, এই যে, যে মানুষ আপন আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে।'

[মন্তব্য — শরীর, মন, আত্মা, পরমাত্মা। শরীর স্থূল ব্যাপার। শরীর কেন্দ্রিকতা জীবত্ব। রবীন্দ্রনাথ মন, আত্মা এবং পরমাত্মা বা ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করছেন।]

মানুষ দুপায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। দুপায়ে উঠে দাঁড়ানো বা হাঁটা খুবই দুরূহ ব্যাপার। মানব-শিশুর প্রথম উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা দেখেই তা বোঝা যায়। বেশি বয়সে লাঠি ভর দিয়ে চলতে হয় মানুষকে। এতেও প্রমাণিত হয়, দুপায়ে চলা সহজ নয়। মানুষ প্রায়ই পড়ে যায়। দুপায়ে চলা যে সহজ নয়, সেটাও তার প্রমাণ। দুপায়ে দাঁড়ানোর জন্য মানুষের দেহে কিছু রোগও হতে পারে। কিন্তু দুপায়ে উঠে দাঁড়ানোতে মানুষ একটি অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখল নিজেকে। দেখল বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে, তার দৃষ্টি দিগন্তে অসীমে পৌঁছল তার দৃষ্টি মুক্ত হল, এই সৃষ্টির সঙ্গে যোগ হল কল্পনা, দুপায়ে দাঁড়ানোতে হাতদুটো মুক্তি পেল। মানুষের কল্পনাবৃত্তি হাতকে পেয়ে বসল। দেহের জরুরি কাজগুলো সেরে দিয়েই, সে লেগে গেল নানান অন্য কাজে। সেই কাজ হল তার বিজ্ঞান, তার দর্শন, তার সাহিত্য, তার শিল্প। মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সঙ্গে সেই সব কাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। মানুষের কাছে নিকটের চেয়ে দূরের দাম বেশি হয়। 'অজ্ঞাত অভাবনীয়ের দিকে তার মন হয়েছে প্রবৃত্ত।'

চারপেয়ে পশুর দৃষ্টি থাকে সীমাবদ্ধ খণ্ডজমিতে। আর মানুষের দৃষ্টি গেল খণ্ডভূমি থেকে বিশ্বভূমির দিকে।

[মন্তব্য — জিরাফ বা উট গাছের অনেক উচ্চ শাখা থেকে খাদ্য চর্বণ করে; খণ্ডভূমিতে তাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে না, আকাশেও যায়। কাক, চিল, বক, শকুনি, ঈগল, তো দূর আকাশে উড়তে পারে, কিন্তু অসীম আকাশে মুক্তি পেয়েও তারা মানুষের মতো হয় না। কারণ মানুষের মস্তিষ্কের গঠন এবং মানুষের হাত এমনভাবে সৃষ্ট যে, তার পক্ষেই শিল্প,সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন রচনা করা সম্ভব। দুপায়ে দাঁড়ালেও পাখি বা বানরের পক্ষে তা সম্ভব নয়।]

মানুষের কাছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের চেয়ে অনেক বেশি দরকারি কাজ হল বিচিত্র বিষয়ের অনুসন্ধিৎসা। দূরতম নক্ষত্রের আলোক-রশ্মি চার পাঁচ হাজার বছর বা তারও বেশি সময় ধরে পৃথিবীতে আসে, তার স্বরূপ মাপতে মানুষের দিনরাত্রি কেটে যায়, অকারণে কথার সঙ্গে কথা জুড়ে মানুষই কবিতা লেখে, যাদের ঠিকমতো আহার জোটেনা,তারাও সেই কবিতার রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামায়, এতেই মানুষের আনন্দ।

মানুষ উত্তর খোঁজে এই প্রশ্নের 'আমি কী?' এই রহস্যের সন্ধানে সে ব্যাপৃত। নিরবধি কাল

জুড়ে চলেছে তার সেই প্রয়াস, তার জন্য কত ধর্মতন্ত্র, কত অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা। সহজ প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করে সে অনুভব করে যে, সে ভিতরে ভিতরে প্রকৃতির চেয়ে বড়ো। সে জেনেছে, আদর্শরূপে (আদর্শ— অনুকরণীয় শ্রেষ্ঠ) যিনি তার চেয়ে বড়ো সে তাঁর সঙ্গে চিরসম্বন্ধযুক্ত।

মানুষের মধ্যে 'আমি' এল, এই আমিকে অহং বেড়ায় সীমাবদ্ধ করলে মানুষের বিনাশ।

অনাদি অতীত ও অসীম ভবিষ্যতের আনন্দ, আশা ও গৌরব যাঁদের, মানুষের সভ্যতা তাঁদেরই রচনা। মানুষ কল্পনা করেছে, অতীতে সত্যযুগ ছিল, অতএব ভবিষ্যতেও আছে সত্যযুগ। সেই অনাগত ভবিষ্যতের আশায় সংকট-সংকুল পথে মানুষের অন্তহীন যাত্রা।

'নইলে পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাকপ্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত।'

[মন্তব্য— প্রতিদিন মানুষকে রান্না করে খেতে হয়, কিন্তু রান্নার বইকে মানুষ কোনও সম্মান দেয় না। অথচ, না বুঝতে পারলেও, এমনকি না-পড়লেও বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বই যত্ন করে কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রেখে গৌরব বোধ করে, সে সব গৃহের অলঙ্কার বলে মনে করে। এই আচরণে মনুষ্যত্বের প্রকাশ।]

'ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের সামনে দুই ব্রাহ্মণ তর্ক তুলেছিলেন, সামগানের মধ্যে যে রহস্য আছে, তার প্রতিষ্ঠা কোথায়।

দালভ্য বললেন 'এই পৃথিবীতেই'।

প্রবাহণ বললেন, 'তাহলে তোমার সত্য তো অন্তবান হল, সীমায় এসে ঠেকে গেল যে।'

কোনো সীমাকেই মানুষ যদি চরম বলে মানত,তাহলে মানুষের ভৌতবিজ্ঞানের অগ্রগতি বহুকাল পূর্বেই বন্ধ হয়ে যেত।

'প্রত্যক্ষ তথ্য উপেক্ষা করলে মানুষের চলে না, আবার সত্যকে না হলেও চলে না। কিন্তু অন্তরে অন্তরে জীব-মানব বিশ্বমানবে প্রসারিত, সেইখানে সে অমিত (অপরিমিত অসীম) মানব, সুখের কাঙাল নয়।'

'উপনিষদে ভগবান সম্বন্ধে একটি প্রশ্নোত্তর আছে,

সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত।

নিজের মহিমায়, সে মহিমাই (মহিমা— মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য, গৌরব) তাঁর স্বভাব। সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত।

মানুষেরও আনন্দ মহিমায়। কিন্তু যে স্বভাবে তার মহিমা, সেই স্বভাবকে সে পায় বিরোধের ভিতর দিয়ে, পরম সুখকে পায় পরম দুঃখে। মানুষের সহজ অবস্থা ও স্বভাবের মধ্যে নিত্যই দ্বন্দ্ব।'

'এই মনুষ্যত্ব বাঁচানোর দ্বন্দ্ব মানবধর্মের সঙ্গে পশুধর্মের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ আর্দশের সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দ্ব।'

'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্' আমার এই আমি আছে প্রত্যক্ষ, সে আমি আছে অপ্রত্যক্ষে।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং শ্রবণের শ্রবণ কোথায় আছেন?

ধর্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। মানুষকে চেষ্টা করে, সাধনা করে স্বভাবকে অর্জন করতে হয়।'

'মানুষের স্বভাবে শ্রেয় আছে, প্রেয়ও আছে। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি সাধু, যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি হীন হন।' (শ্রেয় — শুভ, হিত, ধর্ম; প্রেয় - বাঞ্ছিত, প্রিয়)

মানুষ জানে, সে সহজ নয়, সেইটে প্রমাণ করতে গিয়ে অনেকে বিকৃত উপায় নেয়। সে নাক ফুঁড়ে শলা লাগায়, উখো দিতে দাঁত ঘষে ঘষে ছুঁচলো করে, শিশুকালে তক্তা দিয়ে চেপে

বিকৃত করে মাথায় খুলি, বিকটাকার বেশভূষা তৈরি করে। রেকর্ড ব্রেক করতে চেয়ে নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধনা করে, সাঁতার কাটে ঘন্টার পর ঘন্টা, সাইকেলে অবিশ্রান্ত ঘুরপাক খায়, দীর্ঘ উপবাস করে। এইসব করতে অসহ্য কষ্ট মেনে নেয়, প্রমাণ করতে চায়, সে সহজ নয়। এমন সব কাজকে বলা যায় নঞর্থক। এতে সে তার প্রকৃত স্বভাবে পৌঁছতে পারে না।

'অহংকারের প্রকাশকে আত্মগৌরবের প্রকাশ বলে মনে করা বর্বরতা, যেমন নিরর্থক বাহ্যানুষ্ঠানকে পুণ্যের অনুষ্ঠান মনে করা।'

'সৌন্দর্য কল্যাণ, বীর্য, ত্যাগ প্রকাশ করে মানুষের আত্মাকেই অতিক্রম করে প্রাকৃত মানুষকে, উপলব্ধিকরে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে।'

'মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে মহৎ, তবেই প্রমাণ হবে যে, সে মানুষ। প্রাণের মূল্য দিয়েও তার আপন ভূমাকে প্রকাশ করতে হবে।'

'আপনার পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়।'

'মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ।'

'মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাঁকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে, আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি।'

বক্তৃতা : ২ (সংক্ষেপে)

'আমরা যদি আমাদের জীবধর্ম-সীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি, তবে বলতে হবে সে সত্তা কখনই অমানব নয়,তা 'মানব-ব্রহ্ম'।'

'উনি এবং এ। উপনিষদ বলেছেন, উনি এর পরমগতি, পরম সম্পদ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ। এর পরিপূর্ণতা তাঁর মধ্যে। এর শাশ্বত আনন্দের ধন যা কিছু সে তাঁতেই।'

'সমস্ত মানুষের মধ্যে সে এক আত্মাকে নিজের মধ্যে অনুভব করবার উদারশক্তি যাঁরা পেয়েছেন তাঁদেরই বলি মহাত্মা, তাঁরাই তো সর্বমানবের জন্য প্রাণ দিতে পারেন। তাঁরাই তো এক গূঢ় আত্মার প্রতি লক্ষ করে বলতে পারেন, তিনি পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্য সকল হতে প্রিয়, এই আত্মা যিনি অন্তরতর।'

'মানবমনের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ করে দিয়ে সেই নির্বিশেষে মগ্ন হওয়া যায়, এমন কথা শোনা গেছে। এ নিয়ে তর্ক চলে না। মন-সমেত সমস্ত সত্তার সীমানা কেউ একেবারেই ছাড়িয়ে গেছে কিনা, আমাদের মন নিয়ে সে কথা নিশ্চিত বলব কী করে। আমরা সত্তামাত্রকে যেভাবে যেখানেই স্বীকার করি সেটা মানুষের মনেরই স্বীকৃতি। এই কারণেই দোষরোপ করে মানুষের মন স্বয়ং যদি তাকে অস্বীকার করে, তবে শূন্যতাকেই সত্য বলা ছাড়া উপায় থাকে না।'

'যিনি আমাদের দর্শনশাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম, তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্ অর্থাৎ মানুষের বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয়ের যত কিছু গুণ, তার আভাস তাঁরই মধ্যে। তার অর্থই এই যে মানব-ব্রহ্ম, তাই তার জগৎ মানবজগৎ। এছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে, তাহলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনোকালেই নেই।'

'এই জগৎকে জানি আমার বোধ দিয়ে, যে জানে সেই আমার আত্মা, সে আপনাকেও জানে। এই স্বপ্রকাশ আত্মা একা নয়। আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা, এমন কত আত্মা। তারা যে এক আত্মার মধ্যে সত্য তাঁকে আমাদের শাস্ত্রে বলেন পরমাত্মা। এই পরমাত্মা মানব-পরমাত্মা।'

তৃতীয় বক্তৃতায় কবি বলেছেন, এ নয় যে, চোখ উলটিয়ে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হবে মানুষের থেকে দূরে। গ্রন্থের পরিশিষ্ট মানবসত্য অংশেও কবি বলেছেন, 'বিশ্বদেবতা আছে, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্র তারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে, মনের মানুষ।'

'যিনি সর্বজগদ্‌গত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে 'লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও।' এই সাধনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্তত আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহানপুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে — তিনি নিখিলমানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান। আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।'

[মন্তব্য — কঠ উপনিষদের তিনটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা হোল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমর্থন আছে এখানে।

কঠ উপনিষদ্ ২য় অধ্যায়, ৩য় বল্লী শ্লোক - ৯

ন সন্দৃশে তিষ্ঠাতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।৯

এই যে পরম পুরুষের কথা বলা হল তাঁর প্রকৃত স্বরূপ আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্টির বিষয় নয়। কাজেই আমরা চক্ষু বা অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না। হৃদয়ের অনুভূতি, সংশয়রহিত বুদ্ধিএবং সংস্কৃত মন দ্বারা উনি প্রকাশিত হন। যাঁরা তাঁকে সম্যক জানেন, তাঁরা অমৃত হন।

শ্লোক-১২

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতেহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।।

পরমাত্মা বাক্য, মন এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সুতরাং যাঁরা বলেন 'আত্মা আছেন' সেই আস্তিকগণ ব্যতীত অন্যে অর্থাৎ নাস্তিবাদিগণ কিরূপে তাঁকে উপলব্ধি করবে?

শ্লোক - ১৪
যাদ সর্বে প্রমুচ্যন্তে কাসা যেহস্য হৃদি শ্রিতা:।
অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।।

মানুষের হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত আছে, সেই সকল কামনা যখন দূরীভূত হয়, তখন মরণশীল মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে এবং ইহজীবনেই ব্রহ্মকে ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

'এক আত্মার সঙ্গে আর এক আত্মার সম্বন্ধ সকলের চেয়ে নিবিড়, সকলের চেয়ে সত্য, তাকেই বলে প্রেম। ভৌতিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বাস্তব পরিচয় ইন্দ্রিয়বোধে, আত্মিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সত্য পরিচয় প্রেমে।'

'পিতামাতার প্রেমের রহস্য বুঝতে পারি আপনারই আত্মার গভীরে এবং সে গভীরেই উপলব্ধি করি পিতৃতমকে। ইনি প্রেমের সম্বন্ধে আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎকে পূর্ণ করে আছেন নিখিল মানবলোকে। আহ্বান করছেন দুর্গম পথের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে, অসত্যের থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে, দুঃখের মধ্য দিয়ে তপস্যার মধ্য দিয়ে।'

'এই আহ্বান কোনোকালে মানুষকে কোথাও থামতে দিলে না, তাকে চিরপথিক করে রেখে দিলে। ক্লান্ত হয়ে যারা পথ ছেড়ে পাকা ঘর বেঁধেছে তারা আপন সমাধি রচনা করেছে।'

জন্তুরা পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা, তাঁরা পথ নির্মাতা, পথ প্রদর্শক। বুদ্ধকে যখন কোনো একজন লোক চরম তত্ত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি বলেছিলেন, 'আমি চরমের কথা বলতে আসিনি, আমি বলব পথের কথা।'

[মন্তব্য— বাস্তবে জন্তু বা পশুদের ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং যত্রতত্র, কিন্তু অনেক মানুষ বাসের জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত বড়ো বড়ো বাড়ি তৈরি করে।]

'যদি একথা স্বীকার করতে হয় যে, বেটোভনের রচনা সকলেরই ভালো লাগা উচিত অর্থাৎ চিত্তজড়তা না থাকলে সকল মানুষের তা ভালো লাগবে।'

কিন্তু সকলের ভালো লাগে না, কেননা সকল মানুষের চিত্ত সমানভাবে পরিণত হয় না।

'সমস্ত মানবসমাজে সৌন্দর্যসৃষ্টির কাজে মানুষের যত প্রভূত শক্তির প্রয়োগ হচ্ছে, এমন অল্প বিষয়েই। অথচ জীবনধারণে এর প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন আত্মিক।'

'কেবল জানার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না, হওয়ার দ্বারা পেতে হয়, দুশ্চরিত থেকে বিরত হওয়া, সমাহিত হওয়া, রিপুদমন করে অচঞ্চল মন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে।'

'সেই আত্মাকে জানো, সেই একেকে, যাঁকে সকল আত্মার মধ্যে এক করে জানলে সত্যকে জানা হয়।'

'স্বার্থের জীবনযাত্রায় সুখদুঃখের ভার গুরুতর। মানুষ স্বার্থকে যখন ছড়িয়ে যায়, তখন তার ভার এত হালকা হয়ে যায় যে, তখন পরম দুঃখের মধ্যে তার সহিষ্ণুতাকে পরম অপমানের আঘাতে তার ক্ষমতাকে অলৌকিক মনে হয়। আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহং সীমায় অবরুদ্ধ

জানাই অসত্য। ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে। আমরা দুঃখকে যেভাবে দেখি, বৃহতের মধ্যে সে ভাব থাকতে পারে না, যদি থাকত তাহলে সেখানে দুঃখের লাঘব বা অবসান হোত না।'

বক্তৃতা- ৩ (সংক্ষেপে)

স্থূল অথবা অস্থূল মূর্তিপূজা বাহ্যিক পূজা। মনের মধ্যে মনের মানুষকে অনুসন্ধান করতে হবে। 'অহং থেকে বিমুক্ত আত্মার ভূমার উপলব্ধি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সাধ্য কেননা মানুষের পক্ষে তাই সত্য।' আপনার চিন্তায় কর্মে পরম-মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সবচেয়ে কঠিন সাধনা।'

রবীন্দ্রনাথের অনুভবে সোহহং তত্ত্ব

'অন্তরে হওয়ার দ্বারা জানা। নদী সমুদ্রকে পায়, যেমন করে প্রতিক্ষণেই সমুদ্র হতে হতে। একদিকে সে ছোটো নদী, আর একদিকে সে বৃহৎ সমুদ্র। সেই হওয়া তার পক্ষে সম্ভব, কেননা সমুদ্রের সঙ্গে তার স্বাভাবিক ঐক্য। ...যেমন নদী পায় আপনাকে যখন সে বৃহৎ জলরাশিকে আপন করে, নইলে সে থাকে বদ্ধ হয়ে বিল হয়ে, জলা হয়ে।'

'আমার ব্যক্তিগত আমি তাকে ব্যাপ্ত করে আছে বিশ্বগত আমি। ...যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজে উপলব্ধ হচ্ছে, সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠছি।'

'আমার মন আর বিশ্বমন একই, এই কথাই সত্যসাধনার মূল, আর ভাষান্তরে এই কথাই সোহম্।'

'যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন সোহহং— আমি আমার পরমপিতা একই। কেননা, তাঁর যে প্রীতি, যে কল্যাণবুদ্ধি সকল মানুষের প্রতি সমান প্রসারিত, সেই প্রীতির আলোকেই আপন অহংসীমাকে ছাড়িয়ে পরম-মানবের সঙ্গে তিনি আপন অভেদ দেখেছিলেন।'

'উপনিষদ বলেন, অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে এক করে জানলেই তবে সত্য জানা যায়। অসম্ভূতি যা অসীমে অব্যক্ত, সম্ভূতি যা দেশকালে অভিব্যক্ত। এই সীমায় অসীমে মিলে মানুষের সত্য সম্পূর্ণ, মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার মধ্যে জীবনে সমাজে ব্যক্ত করে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তব সত্য করতে হবে। তা করতে হলে কর্ম চাই।'

'যিনি এই আত্মার মধ্যেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমস্তই অনুভব করেন। আমাদের গোচরে অগোচরে দেশে দেশে কালে কালে নরনারী নিজের অন্তরস্থিত পরমপুরুষের অমিততেজ যদি কল্যাণ ও প্রেমে জ্ঞানে ও কর্মে নিরন্তর সমাজের প্রাণবস্তুতে পরিণত না করত, তাহলে সমাজ সোহহং বর্জিত হয়ে আপন সত্য হতে স্খলিত হয়ে বাঁচতেই পারত না।'

'মানুষের দেহে পশুরক্ত সঞ্চার করলে তাতে তার প্রাণবৃদ্ধি না হয়ে প্রাণনাশ হয়। পশুসমাজ পশুভাবেই চিরদিন বাঁচতে পারে, মানুষের সমাজ পশু হয়ে বাঁচতেই পারে না।'

[মন্তব্য — শুধু পশুরক্ত নয়, গ্রুপ না মিললে এক মানুষের রক্ত অন্য মানুষের শরীরে সঞ্চার করলে মারাত্মক ক্ষতি হয়, প্রাণনাশও হতে পারে।]

'নরলোকে অনেক নরপশু বেড়ে ওঠে। শরীরে ফোড়াও তো বাড়ে। সমস্ত দেহে স্বাস্থ্যের গৌরব সে ফোড়াকে যদি ছাড়িয়ে না যায় তাহলে সে মারে। প্রকৃতিস্থ সমাজ অনেক পাপ সইতে

পারে, কিন্তু যখন তার বিকৃতিটাই হয়ে ওঠে প্রধান তখন চিন্তায় ব্যবহারে সাহিত্য শিল্পকলায় বিকৃতি আত্মস্থ করে সমাজ বেশিদিন বাঁচতেই পারে না।'

পরিশিষ্ট মানবসত্য (সংক্ষেপে)

'মানুষের জন্মভূমি তিনটি, তিনটিই একত্র জড়িত।'

মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্বত্র, স্মৃতিলোকে আছে অতীত কাল থেকে পূর্বপুরুষদের কাহিনী নিয়ে মানুষ জাতির কথা, আত্মিক লোক সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন আঠারো, উনিশ বা কুড়ি, খুব ভোরে উঠে ফ্রি স্কুলের কাছে চৌরঙ্গিতে দাদার বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরাল থেকে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির আবরণ যেন খুলে গেল, মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখতে পেলেন। দেখলেন সমস্ত সৃষ্টি অপরূপ। সে যেন মুক্তি, এইরকম অবস্থায় চারদিন ছিলেন। সকলের মধ্যে যাকে দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আর সংশয় রইল না। তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। যিনি অরূপ কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।

'আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে – এক আমাতেই বদ্ধ, আর এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুইই যুক্ত এবং উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেছি, যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি তখন আমরা মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি, সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ, যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।'

সাজাদপুরে দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলেন, সামনে আকাশে নববর্ষার জলভারানত মেঘ, ছোটোছেলেরা খালের নতুন জলে মেতে উঠেছে, অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কবির মনে একটা অনুভূতি এল, সামনে দেখতে পেলেন, নিত্য কালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ডলীলা। সব মিলিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরম দ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। 'এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্য সাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে। একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন, ইচ্ছে করছে, সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার ক্ষণিককে গ্রহণ করেছেন তাঁর নিত্যে। আমার মধ্যে এ এবং সে – এই এ যখন সেই সে'র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দ।'

'বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়, জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান। সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ।'

কবির তখন বারো বৎসর বয়স হবে। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র পেয়েছেন। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে তাঁর মনে হতো, 'বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ – এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব; বাহির ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলেছে।

'এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত।'

হেমন্তসখা সুভাষ এবং অনুষঙ্গে জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

অরবিন্দ পুরকাইত

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯ - ২০০৩) ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (১৯২০ - ১৯৮৯) ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু। একজন বিখ্যাত কবি হিসাবে, অন্যজন গায়ক হিসাবে। এই বছরটা একজনের জন্মের শতবর্ষপূর্তি আর অন্যজনের শতবর্ষের সূচনা। সেকালের ধারা অনুযায়ী দুজনেই জন্মেছিলেন মামাবাড়িতে। সুভাষ কৃষ্ণনগরে আর হেমন্ত কাশীতে। দুজনেরই ছোটোবেলা কেটেছে গ্রামে। নিজের গ্রাম সম্বন্ধে হেমন্ত তাঁর আত্মস্মৃতি *আনন্দধারা*-তে [১] লিখেছেন, 'আমারও সেই গ্রামে খুব ছোটবেলা কেটেছে। আমাদের গ্রাম হল বড়ুতে। শুদ্ধ ভাষায় বহড়ু। জয়নগর-মজিলপুর-এর পাশের গ্রাম। আমাদের চোদ্দপুরুষের ভিটে। সেই ভিটেমাটি এখন চাটি হয়ে গেছে। ওখানেই এককালে আমার ঠাকুর্দা বাস করতেন। দু-পাশে বাঁশবাগান মাঝখানে আমাদের বাড়ি।' আর তিন-চার বছর বয়স অবধি কলকাতার ৫০ নেবুতলা লেনে কাটার পর, বাবার চাকরিসূত্রে গোটা পরিবারের সঙ্গে সুভাষের কাটতে থাকে রাজশাহির নওগাঁয়। দুজনেরই গ্রামে ছোটোবেলা-কাটানোর স্মৃতি রয়েছে।

হেমন্তর মা কিরণবালা প্রচুর কবিতা পড়তেন। হেমচন্দ্রের বহু কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল এবং সেইসব কবিতা সুর করে বলতে বলতে ঘুম পাড়াতেন ছেলেমেয়েদের। নিজের গলায় সুরের পিছনে মায়ের ওই সুর করে কবিতা বলার উত্তরাধিকার স্বীকার করেছেন হেমন্ত। মিষ্টি গলার অধিকারী হেমন্ত আজীবন চিৎকার করে কথা বলতেন না। কৃষ্ণনগরের মেমদের স্কুলে-পড়া সুভাষের মা মৃদুকণ্ঠী যামিনীবালা চমৎকার কথা বলতে পারতেন। এমনটা যে কেবল তাঁর কথা শোনার জন্যে কেউ কেউ তাঁকে রাগিয়ে দিতেন! সুভাষের প্রবাদ-প্রবচনভরা অমন চৎমকার আটপৌরে বাংলার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই কাজ করেছে মায়ের উত্তরাধিকার।

দুজনেরই কলকাতায় চলে-আসা কৈশোরে এবং উভয়ক্ষেত্রেই তাঁদের পিতার চাকরির সূত্র রয়ে গেছে। হেমন্তর পিতা কালিদাস ও সুভাষের পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র উভয়েই চাকুরে হলেও, সংসারে সেইভাবে সচ্ছলতা ছিল না। হেমন্তরা চার ভাই, এক বোন, আর ছটি সন্তানের মধ্যে বেঁচে বর্তে-থাকা সুভাষরা দুই ভাই আর এক বোন। বদলির চাকরিতে ক্ষিতীশচন্দ্র সুভাষের বছর-বারো বয়সে এসে উঠলেন তাঁর মেজো ভাইয়ের বাসা মধ্য কলকাতার এঁদোগলি বাঞ্ছারাম অক্রুর লেনে হেমন্তর কলকাতায় আসা আট বছর বয়সে। কালিদাস পৈতৃক-সম্পত্তি-হিসাবে-পাওয়া ভবানীপুরের ছাব্বিশের দুইয়ের এ রূপনারায়ণ নন্দন লেনে এক কাঠা জমিতে দুখানা ঘরের এক বাড়ি তৈরি করেন।

কলকাতায় যাওয়ার প্রসঙ্গে হেমন্ত লিখেছেন, 'কলকাতায় যাব শুনে মনে মনে খুব আনন্দ হল প্রথমে। কিন্তু তারপরই মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই গ্রামের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে মনে মনে। রোজ ভোরে উঠে দাদা আর আমি ঠাকুরের জন্যে ফুল তুলতে যেতাম। গুরুমশাই-এর পাঠশালায় পড়তে যেতাম দু'জনে। কঞ্চির কলমে ভুষোর কালি দিয়ে তালপাতার ওপর লিখতাম। পাঠশালার পড়া শেষ করে গ্রামের হাইস্কুলে ভর্তি হলুম যখন তখন সে কি উৎসাহ! এখানকার প্রতিটি গাছপালা, নদীনালা, মাঠঘাট মনের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার। ভোরের বাতাস, পাখির ডাক, রাতের জোনাকি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। সব ছেড়ে চলে যেতে হবে।' আর নওগাঁর মাঠঘাট-আকাশ, তার এসডিও বাংলোর পিছনে যমুনা নদী, মুনসেফবাবুর বাংলো, কে ডি হাইস্কুল, জেলখানা, উকিলপাড়া ইত্যাদি

এমনভাবে জড়িয়ে গেল সুভাষের সত্তায় যে সারা জীবন রয়ে গেল তার সুরভি! তবু সেই নওগাঁ থেকে যখন কলকাতায় আসেন, সঙ্গীসাথীদের জন্যে মনখারাপ করলেও, একটা গুমর ভর করেছিল মনে – যেন, মেরে দিয়েছি কেল্লা আর তারপর সেই এঁদোগলিতে এসে কী যে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল মন! আর ওদিকে, নতুন জায়গা, রাস্তাঘাট চেনা নেই, এদিক-ওদিক ঘুরতে গিয়ে পাছে হারিয়ে যান তাই হেমন্তর বাবা ছেলেমেয়েদের মুখস্থ করাচ্ছেন রাস্তার নম্বর। প্রসঙ্গত, সুভাষদের গ্রাম ছিল বর্তমান বাংলাদেশের লোকনাথপুর। *চরৈবেতি চরৈবেতি* পুস্তকের[২] *ইতিহাসের হাত ধরে* শীর্ষক এক লেখায় লিখেছেন সুভাষ, 'ছেলেবেলায় দর্শনায় নেমে আমরা গোরুগাড়িতে মেঠোরাস্তায় ধুলোকাদা ভেঙে ঢিকোতে ঢিকোতে গ্রামে গিয়ে পৌঁছুতাম। একটু বড়ো হয়ে আমি আর দাদা নলগাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা সংক্ষেপ করে হাঁটাপথে আমবাগানের ভেতর দিয়ে গিয়ে ঠেলে উঠতাম গাঁয়ে।'

নওগাঁয় আট বছর বয়সে সুভাষকে মাইনর স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। কলকাতায় বারবার ঠাঁইনাড়া হতে হয়েছিল সুভাষদের। ত্রিশের দশকের অর্থনৈতিক সংকটের সময় বউবাজারের এক্সাইজ ব্যারাকের বড় বাড়ি ছেড়ে দক্ষিণ শহরতলিতে চলে আসতে হল যখন, সপ্তম শ্রেণিতে মেট্রোপলিটন স্কুল ছেড়ে ভর্তি হতে হল সুভাষকে সত্যভামা ইনস্টিটিউশনে। তারপর মিত্র ইনস্টিটিউশনে। 'আমি সত্যভামা ছেড়ে ভবানীপুর মিত্র ইস্কুলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম শিক্ষকদের সংগ্রামে জড়িয়ে প'ড়ে।' – লিখেছেন সুভাষ তাঁর *চিঠির দর্পণে* পুস্তকে।[৩] আর বাড়ির কাছে উচ্চবিদ্যালয় নাসিরুদ্দীন মেমোরিয়াল স্কুলে কয়েক বছর পড়ার পর মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হওয়া হেমন্তর। এই প্রসঙ্গে হেমন্ত লিখেছেন, 'জগদীশ তো আমার বন্ধু ছিল আগেই। এখানে ভর্তি হয়ে আমি আমার সহপাঠীদের মধ্যে আরও কয়েকজন বন্ধুকে পেলাম। পেলাম সমরেশ রায়, পরিমল সেন, রমাকৃষ্ণ মৈত্র আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। সুভাষ এখন এ-যুগের বিখ্যাত কবি। দেশের দশের কাছে সুপরিচিত। আর রমাকৃষ্ণ, যে সুভাষ আর আমার মাঝখানে সবসময় থাকত সেও গল্প লিখতো খুব। এখন সব ছেড়েছু ড়ে দিয়েছে। লেখা ছাড়লেও সুভাষকে ছাড়েনি রমা। এখনও ওদের দুজনকে প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যায়'।[৪]

একজন কবি ও অন্যজন গায়ক হিসাবে পরবর্তীকালে বিখ্যাত হলেও, সেই কৈশোরে তাঁদের মিলিয়ে দিয়েছিল কিন্তু সাহিত্যই। হেমন্তদের পাড়া ভবানীপুরের কল্যাণ-সংঘ পাঠাগারে সপ্তাহান্তে বসত সাহিত্যসভা। হেমন্ত ছিলেন সেখানকার সাহিত্যশাখার সম্পাদক। সেখানে নিজেদের লেখা কথিকা-গল্প-কবিতা ইত্যাদি পড়া হত। হেমন্ত ছিলেন ভালো গল্পলিখিয়ে। *দেশ*-এর মতো মান্য পত্রিকায় গল্প ছাপা হয়েছে তাঁর। সাহিত্যের জগৎ থেকে সঙ্গীতশিল্পীর জীবনে থিতু হওয়ার পিছনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা কম উজ্জ্বল নয়। হেমন্তর একটি গান আছে, 'এক দিনেতে হইনি আমি তোমাদের এই হেমন্ত'। গায়ক হেমন্তর সেই হয়ে-ওঠার সূচনাপর্বে বন্ধুবৎসল সুভাষের অবদান উজ্জ্বল হয়ে রয়ে গিয়েছে। বিদ্যালয়-জীবনেই সুভাষরা টের পেয়েছিলেন হেমন্তর গানের গলা। রেডিওতে গান গাওয়ার পরেও রেকর্ড কোম্পানিগুলিতে পাত্তা পাননি হেমন্ত। হেমন্ত লিখেছেন, 'সুভাষ আমাকে নিয়ে গেল একে একে সব রেকর্ড কোম্পানিতে। সেনোলো, পাইওনিয়ার, মেগাফোন, এইচ.এম.ভি। কেউ নিলে না। সবাই ফিরিয়ে দিল।' তা বলে তো গান থামালে চলে না। গান চলতে থাকল আর সেইসঙ্গে চলতে লাগল সাহিত্যচর্চা। সাহিত্যপথে হেমন্ত সঙ্গী পেলেন সুধাংশু সেনগুপ্ত, সন্তোষ ঘোষ, জগৎ দাস, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের। *দেশ* পত্রিকায় *একটি*

ঘটনা গল্পটি প্রকাশ পেলে (১৯৩৭) অনেকে বাহবা দিল। সাহিত্যসভায় পড়তে থাক
নতুন-লেখা-গল্প। সুভাষের লেখালিখিরও তখন প্রায় একই অবস্থা, যেখানে লেখা পাঠান যে
আসে! কেবল প্রচুর বিদেশি গল্প-উপন্যাস-পড়া রমাকৃষ্ণ 'পাকা-পাকা গল্প' লেখেন, *পরিচয়*
ছাপা হয়। স্কুল শেষে সুভাষ আর রমাকৃষ্ণ ভর্তি হলেন আশুতোষ কলেজে আর হেমন্ত যাদ
পলিটেকনিকে। ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করা হে
বাবার ইচ্ছে ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হোক। ভবানীপুর থেকে যাদবপুরের বাস ছিল না তখন, যেতে
ট্রেনে বালিগঞ্জ যেতে হবে। সুতরাং সাইকেলের বন্দোবস্ত। সুভাষদের বাড়িতে হেমন্তর অ
সাইকেলে যাদবপুর যাতায়াতের পথে। সুভাষ লিখেছেন, 'আমি আর রমা প্রাণপণে চেষ্টা ক
হেমন্তকে গানের দিকে *ঠেলতে*। যার লেখা দেশ-আনন্দবাজারে ছাপা হয়, তাকে সাহিত্য থে
সরানো অত সহজ নয়' হেমন্ত লিখেছেন, 'এর মধ্যে একদিন সুভাষ বললে, সাহিত্য নিয়ে তো
মাতামাতি হচ্ছে, কিন্তু গানটা তো ছাড়লে চলবে না। রেডিওতে তো গান হয়েছে। এবার রেক
জন্যে চেষ্টা করতে হবে।' ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে 'বল গো বল মোরে
'জানিতে যদি গো তুমি' গান দুটি দিয়ে হেমন্তর রেকর্ডে গান গাওয়া শুরু। প্রসঙ্গত, সুভাষের
লেখায় *দেশ*-এর সঙ্গে *আনন্দবাজার*-এর নামও এক লপ্তে উচ্চারিত হলেও, আনন্দবাজার পত্রি
হেমন্তর কোনো গল্প ছাপা হয়নি।

তা রেডিওতে গানের ক্ষেত্রে কী কম ভূমিকাটি পালন করেছেন সুভাষ! 'বড়লোক
স্কুল' মিত্র ইনস্টিটিউশনে পড়াতে হেমন্তর বাবাকে আবেদন-নিবেদন করে হাফ-ফি করিয়ে নি
হয়েছিল। গানপাগল হেমন্ত, যিনি শুনে শুনে গান তুলে নিতে পারতেন; যাঁর বাড়িতে হারমোনি
ছিল না, বন্ধু শ্যামসুন্দর তাঁর বাড়িতে হারমোনিয়ামে গান তোলার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিে
সকলের সঙ্গে স্কুলের অফ পিরিয়ডে গান গাওয়ার সময় সহ-প্রধান শিক্ষকের সামনে কেবল তি
স্বীকার করলে যাঁর নাম কাটা যায় স্কুলের খাতা থেকে এবং অপমান সহ্য করে বাবাকে গিয়ে আ
নাম তোলাতে হয়; বন্ধুদের অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে গান শোনান তো বটেই, বিয়েবাড়িতে বা বে
ছোটোখাটো অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্যে যিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন; সেই হেম
স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভা ইত্যাদিতে কর্তৃপক্ষ গান গাইতে দেয় না, গাইতে দেয় কেবল সমরেশ
হেমন্ত শুধু শোনেন, বুকে কষ্ট নিয়ে। 'সুভাষ এ সব দেখে ক্ষেপে উঠত। বলত, এ যে দেখছি
জমিদারী ব্যাপার। যা খুশি তাই করবে! তুই এত ভাল গাস আর তোকেই কিনা বাদ দেয় ফাংশ
এ সব চলবে না।' নিশ্চয়ই তারা ভালো গায় বলেই সুযোগ পাচ্ছে – হেমন্ত এ কথা বলায়, সু
বলেন যে চেষ্টা করলে সুযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু সুযোগ পেলেই বড় গাইয়ে হওয়া যায় না। এই
অনেক কথাই বলেছেন তখন সুভাষ। হেমন্ত লিখেছেন, 'সেই বয়সেই সুভাষের কবিতার হাত
পাকা। ওর চিন্তাধারাও ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ।' আর এরপর একদিন সুভাষ বললেন, 'তোকে
ইস্কুলের ছেঁদো ফাংশানে গাইতে হবে না। ওরা ভাল গাইয়েদের নিয়ে ফাংশান করুক। তুই
আমার সঙ্গে, রেডিও স্টেশনে। অডিশানের ব্যবস্থা পাকা করে এসেছি।'[৮]

তারপর এক নম্বর গার্স্টিন প্লেসের 'ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন'-এ গান গাওয়ার জন্যে
করে নিয়ে যাওয়া; অডিশানে পাশ করার পর, রেডিওতে গান গাইতে দেওয়ার ব্যাপারে গোঁড়া
বাবার অমত (সমাজের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ সব সীমাবদ্ধতা ছিল তখন) হওয়া
মুষড়ে-পড়া-হেমন্তর সুভাষের বাড়ি গমন। সুভাষ বললেন, 'তোকে গাইতেই হবে। চল, অ

সবাই মিলে তোর বাবাকে বুঝিয়ে বলি।' শেষ অবধি তার আর দরকার হয় না অবশ্য, মা বুঝিয়ে বলতে, শেষে একবারের জন্যে রেডিওতে গান গাইতে দিতে রাজি হন তাঁর বাবা (পরে নিজেই আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন)। তো কোনোদিন গান-না-লেখা সুভাষ হেমন্তর কথায় সারা দুপুর ধরে গান লিখলেন — সদ্য বেরোনো যুথিকা রায়ের গাওয়া একটি গানের কমল দাশগুপ্তকৃত সুর অনুযায়ী বাণী বসিয়ে। দশ মিনিটের অনুষ্ঠানে প্রথম গাওয়া দুটি গানের মধ্যে সেটি ছিল – 'আমার গানেতে এলে নবরূপে চিরন্তনী,/ বাণীময় নীলিশায় শুনি তব চরণধ্বনি।'

সুভাষের কথা একটু বলে নিতে হয়। বুদ্ধদেব বসুর *কবিতা* পত্রিকা পড়িয়ে আধুনিকতার দিকে সুভাষের নজর ফিরিয়েছিলেন তাঁদের ক্লাসের প্রফুল্ল চক্রবর্তী। একটা সময় এল, যে লেখাই পাঠান মনোনীত হয়ে যায়। 'আনন্দবাজার পুজো-সংখ্যার সম্পাদক অরুণ মিত্র, কবিতা পত্রিকার বুদ্ধদেব বসু, যুগান্তর-রবিবাসরের প্রবোধ সান্যাল চিঠি দিলেন দেখা করার জন্য। কামাক্ষীপ্রসাদ -দেবীপ্রসাদদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয় সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সমর সেনের সঙ্গে দেবীদের ল্যান্সডাউন রোডের ফ্ল্যাটেই আলাপ। আমি তখন রোজ বন্দিমুক্তির মিছিলে হাঁটি। সভায় যাই। রাজনীতির দিকে আমার প্রবল ঝোঁক দেখে সমরবাবু একদিন ওঁর *হ্যান্ডবুক অব মার্ক্সইজম* বইটা আমার হাতে দিয়ে বললেন – এটা রাখো, তোমার কাজে লাগবে।' – লিখেছেন সুভাষ।[৬] বইটি শেষ করে সবকিছু নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখলেন। লেবার পার্টিতে যোগ দিয়ে খিদিরপুরের ডক-শ্রমিকদের মধ্যে কাজে লেগে গেলেন। আর দু-তিন বছর পরে, ১৯৪০ সালে বুদ্ধদেব বসুর হাতে তাঁর কবিতার বই *পদাতিক* বেরিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

সুভাষ তাঁর *একটু পা চালিয়ে, ভাই* কবিতার বইটি[৭] হেমন্তকে উৎসর্গ করে লেখেন, 'গানে রেকর্ড-করা কিন্নরকণ্ঠ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বন্ধুবরেষু।' আজকাল প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হেমন্তর গল্পের বই *হেমন্তর গল্প*-এর [৮] ভূমিকা লিখেছেন সুভাষ। সেখানেও লিখেছেন যে একদা গল্পই লিখত হেমন্ত, কিন্তু তাঁর গলায় গান শোনার পর, তাঁরা 'দুই পরম বন্ধু' রমাকৃষ্ণ মৈত্র আর তিনি হেমন্তর নৌকোটাকে ঠেলে 'গল্পের ঘাট থেকে কায়দা করে গানের ঘাটের দিকে ভিড়িয়ে' দিয়েছিলেন। এখানে একটু বলে নেওয়া যাক, এই বইটিতে 'আইডিয়ার কামড়' শীর্ষক নিজের কথায় হেমন্ত লিখেছেন যে, পনেরো বছর বয়সে তাঁর গল্প প্রথম প্রকাশিত হয় 'আলেয়া' নামে এক পত্রিকায়। তারপর *বাতায়ন* পত্রিকায় কয়েকটি গল্প লেখেন। কিন্তু তিনি লিখেছেন যে তাঁর যে গল্প 'পাঠকসমাজে খানিকটা সাড়া তুলেছিল' সেটি দেশপত্রে প্রকাশিত পূর্বোক্ত *একটি দিন*।[৯] দেশ-এর তৎকালীন কর্ণধার পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় গল্পটির প্রশংসা করেছিলেন বলে শেষ বয়সেও রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন হেমন্ত। এখানে জানিয়েছেন হেমন্ত, যে মনগড়া গল্প লিখতে পারেন না তিনি। জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকেই গল্প লেখা তাঁর। হেমন্তর *শতাব্দীর আর্তনাদ* গল্পটি এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করেছিলেন সুভাষ, পড়তে পড়তে চোখে জল এসে গিয়েছিল। লিখেছেন যে একেবারে জীবন থেকে নেওয়া সে গল্প। আক্ষেপ করেছেন ব্যর্থ শিল্পীর সে গল্প আর কোনো সার্থক শিল্পীর কলম দিয়ে বেরোয়নি বলে। লিখেছেন, 'তার মানে সার্থকতার শেষ ধাপে উঠে গিয়েও সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপে দাঁড়িয়ে ওপরে উঠতে না পারা ভাগ্যহত মানুষগুলো সম্বন্ধে সমবেদনা আজও পূর্ণমাত্রায় তার মধ্যে থেকে গেছে'।[১০]

'করুণা নয়। ভালবাসা। অন্যের ব্যথার সুর নিজের প্রাণের তারে বাজিয়ে তোলা'।

'অনায়াসে গল্প থেকে গানে, গান থেকে গল্পে –'

হেমন্তর গল্প-এর উক্ত ভূমিকার শেষে লিখছেন সুভাষ, 'জীবনে হেমন্ত তো দেখেছেও অনেক। এমন গল্প লিখতে থাকলে, রমার হয়ে আমিও কথা দিচ্ছি – গল্পের ঘাটে নৌকো ভেড়াতে আর আমরা বাধা দেব না।'

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুকান্তর জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শ্যামবাজারে কমল বসুর বাড়ি-সংলগ্ন মাঠে হেমন্ত ও সুচিত্রা মিত্রের যে গানের অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে বড় ভূমিকা ছিল সুভাষের। আবার সুকান্তর প্রয়াণের পর সুভাষের *সপ্তাহ* পত্রিকার উদ্যোগে স্টুডেন্টস হলে যে স্মরণ-অনুষ্ঠান হয়েছিল তার প্রধান উদ্যোক্তা ও বক্তা ছিলেন সুভাষ, সেখানে সুকান্তর অবাক পৃথিবী, বিদ্রোহ গেয়েছিলেন হেমন্ত।[১১]

হেমন্ত ও সুভাষ, দুজনেরই জীবনে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা– এক জনের জন্মসূত্রে আর অন্যজনের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে– কর্মসূত্রে। হেমন্তর ঠাকুরদা বিদ্যাবাগীশ মহামহোপাধ্যায় হরিহর মুখোপাধ্যায় ছিলেন টোলের পণ্ডিত। আত্মস্মৃতিতে হেমন্ত তাঁদের গৃহদেবতা বাবা দধিবামনের কথা লিখেছেন, ঠাকুমার সজ্ঞানে অন্তর্জলি যাত্রার কথা লিখেছেন, 'সেই সময় আমাদের গ্রামে বাস এল। সেই প্রথম বাস দেখলুম। ট্রেন তখনও আসেনি। সবে রেললাইন পাতা হয়েছে। দু'টো ট্রলি লাইনের ওপর ঘোরাফেরা করছে। সেই ট্রলিতে আমিও একদিন চড়েছি। কিন্তু বরাত খারাপ। ট্রলি থেকে নামতেই গিয়ে পড়ে গেলাম লাইনের ওপর। পা ভাঙল।' স্মরণ করেছেন সুনীলদার সেদিন তাঁকে কোলে করে বাড়িতে নিয়ে আসার কথাও। ভাই তারাজ্যোতির স্মৃতিচারণায় পাচ্ছি ছোটোবেলায় হেমন্তর মিষ্টিপ্রীতির এক ঘটনা। হঠাৎ একদিন পাওয়া যাচ্ছে না হেমন্তকে। খুঁজতে বেরিয়ে ঠাকুরদা কিছুটা যাওয়ার পর দেখলেন তাঁর নাতি বসে একটি মিষ্টির দোকানে! বড় একটা রসগোল্লা মুখে-পোরা, আর একটা হাতে! ঠাকুরদা খোঁজাখুঁজির কথা বললে, দোকানি হেসে বললেন, 'ও নিজে এসে আমাকে বললে, মিষ্টি খাব। ভারি মিষ্টি কথা আপনার নাতির। আপন-পর জানে না।' ঠাকুরদা দাম দিতে গেলে, কিছুতেই তা নেন না; তাঁর নাতিকে মিষ্টি খাওয়াতে পারাটা অনেক বড় পুণ্য মেনেছেন দোকানি।[১২] এই মিষ্টির প্রতি টান ছিল হেমন্তর শেষ দিন পর্যন্ত, যদিও মধুমেহ রোগ তাতে বাধ সাধত বহুদিন ধরে।

বড়লোকের বিটি গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুব মিত্রের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরে (যে ধ্রুব মিত্রের সঙ্গে পরে বিয়ে হয় সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সুচিত্রার – রবীন্দ্রগানের খ্যাতনামা শিল্পী সুচিত্রা মিত্র। সুচিত্রার সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে ধ্রুব বিয়ে করেন আর এক গীতাকে) কিছুদিন বার্লিনে বাবার কাছে কাটিয়ে এসে বিয়ে করে বসলেন সুভাষকে (১৯৫১ সাল) এবং বজবজের ব্যঞ্জনহেড়িয়াতে এক গরিব মুসলমানের বাড়িতে গিয়ে গাড়লেন আস্তানা। মূলত গীতার ইচ্ছায় হলেও, সুভাষের জীবনে ১৯৫২ সালের এই ব্যঞ্জনহেড়িয়া-পর্বের গুরুত্ব যথেষ্ট। সেইটুকু অতি সংক্ষেপে বলেই এই লেখা শেষ করব আমরা।

নতুন এই ঠিকানাটা ছিল অখণ্ড চব্বিশ পরগনা জেলার বজবজ থানার ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের ৭৩, ফকির মহম্মদ খান রোড। মাটির বাড়ি, টিনের চাল। বাইরে ছোটো একটু বারান্দা, শানের মেঝে। সামনে ঝাঁপের বেড়া। তাঁদের এই ব্যঞ্জনহেড়িয়াবাসের সিদ্ধান্ত নিয়ে কেউ বলতে লাগলেন যে 'নিরিবিলিতে সাহিত্যসাধনা করার জন্যে বনবাস' নিয়েছেন তিনি; কেউ বা বললেন, 'ম্যাস কন্টাক্ট করে উপন্যাস লেখার জন্যে' বজবজ গেছেন। লিখেছেন, 'আমাদের বজবজ যাওয়া নিয়ে শুধু পার্টির লেখক মহলে নয়, ট্রেড ইউনিয়নের কমরেডদের মধ্যেও বেশ একটু গুঞ্জন উঠেছিল।

শ্রমিক আন্দোলন করার জন্যে শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে থাকতে হবে এ ধারণা অনেকের কাছেই বেশ একটু সেকেলে বলে মনে হয়েছিল। কেউ কেউ আড়ালে মুচকি হেসে বলেছিল – যেতে দাও, দুদিনেই শখ মিটে যাবে। তখন বাপ্ বাপ্ করে কলকাতায় পালাবে।' সেখানকার লোকেদের সঙ্গে ভাব হয়ে যাওয়ার পরে তাঁদের মুখে শুনেছিলেন যে তাঁকে নিয়ে প্রথম প্রথম গুজব ছিল বড়লোকের বউকে ফুস্‌লে নিয়ে গিয়ে সাময়িক ভাবে গা ঢাকা দেওয়ার বা গোয়েন্দাগিরির। বিশেষত সন্দেহ এই কারণে যে, যে বাড়িতে উঠেছিলেন তাঁরা, বাড়িটি করার পরেই তার মালিক মারা যায়। মালিকটি কী করত তা কেউ বলত না, 'লোকে শুধু বলত ও ছিল ডাকাবুকো দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ। ইয়া বুকের ছাতি। একদিন রাত্রে নাকি সড়কি বেঁধা অবস্থায় ওকে ধরাধরি করে এনেছিল। শক্ত জান। দিন কয়েক মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে তবে মরেছিল।[১৩] বাড়িতে ছিল তার দুই মেয়ে আয়মন আর সকিনা, এক ছেলে খাঁদু এঁদো এক পুকুরের ওপারে ফুফু খতেজানের কাছে থাকত। ('বেজায় খাণ্ডারী মহিলা' বলেছেন তাকে সুভাষ)।

বজবজের স্মৃতিতে উঠে এসেছে মড়ক লেগে পাড়ার মোরগগুলোর সাফ হয়ে যাওয়া 'ঘাটে ঘাটে ডাঁই ডাঁই পোড়া বাসনে জোরে জোরে ঝামা ঘষার শব্দে, এক কোমর জলে একসঙ্গে অনেকগুলো হাতে গামছা আছড়ানোর শব্দে' সে গাঁয়ে 'হঠাৎ ঝপ্ করে সকাল' হওয়া; জলের উপর তেলচিটে চাদর বিছিয়ে দেওয়ার মতো পাতা-পচা ছ্যাতলায় আকণ্ঠ বুজে-থাকা 'বাঁশবাগানের ফাঁক দিয়ে গলে-আসা ফালি ফালি রোদ্দুর' কারখানার বাঁশি বেজে ওঠা, কাজে যাওয়ার লোকেদের জলে ঝাপটা দিয়ে দিয়ে জলের সেই গ্যাঁজলা সরিয়ে স্নান করা; নীচু চালের বাড়ির দেওয়ালে 'গ্রামদেশের কোনো নামগোত্রহীন শিল্পী'র আঁকা ছবি; সজনে গাছের পাতা-খসা ভুতুড়ে ডালের নীচে টিনের চালে হাত কয়েক রোদ্দুরের ঢেউ-খেলা; মাকড়সার জালে ডজন ডজন শুঁয়োপোকার আটকে পড়া; আঁশফল গাছে দুলতে-থাকা সবুজ লাউডগা সাপ ইত্যাদির কথা। আছে 'আ-তু, আ-তু' ডাক, হাঁসের দলের প্যাঁক্ প্যাঁক্, কেরোসিন তেলওয়ালার 'কা-চিন' হাঁক, ঘণ্টা নাড়াতে নাড়াতে গোলাপি রঙের 'বুড়ির চুল' বেচা, সুন্দর গলায় গান গেয়ে হরিদাসের কুড়মুড় কুড়মুড় ভাজা বেচা' ভাঙা লোহা-পেতল, ঝাঁটার কাঠি, হাঁস-মুরগি কিনতে আসা; গরু চরাতে যাওয়া, হাঁড়ি বগলে নিয়ে গিন্নিবান্নিদের খালে মাছ ধরতে যাওয়া ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনহেড়িয়াতে নিজের কাজকর্ম, যাপন ইত্যাদি নিয়ে লিখেছেন সুভাষ, 'ব্যঞ্জনহেড়িয়াতে মন বসে গেছে। জলটাই যা একটু গোলমাল করছে। স্নানের জন্যে সামনের পাতাপচা পুকুর। গোড়ায় গোড়ায় গন্ধ লাগত। এখন সয়ে গেছে। বাড়ির কাজ করে দেয়, অন্য একটা পুকুর থেকে খাবার জল এনে দেয় এ গাঁয়ের এক বিধবা বুড়ি। আমরা তাকে পিসি বলে ডাকি।

'ভোরে গেট মিটিং। সকালে দুটো নাকে মুখে গুঁজেই চলে যেতে হয় বাসে সটান আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। 'বাঙালীর ইতিহাসের গ্রন্থসূচীর সব বই পড়ে ফেলেছি। ইতিহাস ছেড়ে ঢুকে পড়েছি নৃতত্ত্বের রাজ্যে।'

'সন্ধেবেলায় ফিরে হয় পার্টি আপিস, ইউনিয়ন আপিস, নয় বস্তিতে। গীতার সঙ্গে ওখানেই কোথাও দেখা হয়ে যায়। রাত্তিরে দুজনে যখন ফিরি, দূর থেকে আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে ছুটতে ছুটতে আসে দোআঁশলা কুকুর বিলি আর তার ল্যাজে ল্যাজে আমাদের বেড়াল রুসি।'[১৪]

বজবজের কাজে-যাওয়া মানুষদের চিত্র কিছুটা উদ্ধৃত করেছেন তিনি *চিঠির দর্পণে* পুস্তকে, তাঁরই *যখন যেখানে বই*[১৫] থেকে। খানিক উদ্ধৃত করি আমরা: 'আগে থেকে গিয়ে যাদের মেশিন

ঝাড়পুঁছ করে নিতে হবে, তারা পোয়া-বাঁশী বাজবার আগেই বেরিয়ে পড়বে। ক্রমেই ফুলেফেঁপে উঠতে থাকবে চড়িয়ালের রাস্তায় হাফপ্যাণ্ট পরা কোমরে গামছা-বাঁধা মানুষের দীর্ঘ মিছিল। কারো হাতে ঝোলানো টিফিনের বাক্স, কারো কোঁচড়ে পুঁটুলি-বাঁধা শুকনো মুড়ি। হাত মোছার জন্যে দড়িতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে কেউ কাটা-ছেঁড়া পাটের পাকানো বাণ্ডিল। কারো ট্যাঁকে ঝুলছে ধারালো উলঙ্গ ছুরি। চটকলে কাজ করতে লাগে।

'মোড়ে মোড়ে শাখা নদীর মত ভাগ হয়ে যাবে একেকটি দঙ্গল। কেউ যাবে তেল ডিপোয়, কেউ ঠিকে কাজে। যাদের তখনও ইস্কুলে পড়বার বয়েস, গোঁফের রেখা উঠতে ঢের বাকি — তারাও সেই সকালের মিছিলে সার দেবে। আর যাবে গাঁ থেকে আসা স্বামীপুত্রহীন নিরুপায় কিছু মেয়ে, হয় কয়লা কুড়োতে, নয় মাটি কাটতে। সেইসঙ্গে গাঁয়ের রাস্তায় লাঠি ঠুকতে ঠুকতে টুক টুক করে ভিক্ষেয় বেরোবে মাজা-ভাঙা একদল বুড়ি — তিনকাল গিয়ে যারা এককালে এসে ঠেকেছে।'

লিখেছেন যে সবচেয়ে ভারী মিছিলটা চটকলের 'হাঁ মুখের মধ্যে ঢুকে যাবে'। একদল গিয়ে আবার বেরিয়ে আসবে, কেন-না তাদের কাজ নেই – 'অস্থায়ী বদ্‌লিওয়ালা তারা'। কাজ পাক আর না পাক, রোজ দুবেলা হাজরি দিতে হবে তাদের।' 'টিকিট পায় না তারা, খাতাতেও হয়ত নাম নেই। বছরের পর বছর এমনি করে কেটে যাবে। মাথার চুল পেকে যাবে – তবু পাকা কাজ জুটবে না তাদের কপালে। এখানে সেখানে যাদের ঠিকে কাজ, তাদেরও ঐ এক দশা। চালু-বাঁশী বেজে গেলে হাতে টিফিনের বাক্স নিয়ে সর্দারবাবুদের গুষ্ঠিনাশ করতে করতে সকালের একটা মিছিল ঘাড় গুঁজে আবার গাঁয়ে ফিরবে' – এই কঠিন কঠোর বাস্তব চিত্র এঁকেছেন সুভাষ।

একসময় নোঙর তুলতেই হল বজবজ থেকে। সে-প্রসঙ্গে লিখছেন সুভাষ, 'বেশ বুঝতে পারছি, বজবজের পাঠ তোলার এবার সময় হয়েছে। এখানকার জল গীতার সইছে না। কল কিংবা টিউবওয়েলের জল তো নয়। খেতে হয় পুকুরের জল। গাঁসুদ্ধ পেটের রোগ লেগেই আছে।' চলে আসার অনুভূতি কেমন? লিখছেন, 'আসলে এখানকার জীবনের সঙ্গে আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়েছি। বজবজ বলব না, আসলে এই গ্রাম চটকলের মানুষজন — এদের ওপর এক অসম্ভব মায়া পড়ে গেছে। আবেল সাহেব এখন বদ্ধ কালা। খাঁদুদারও শরীর ভালো নয়। দুজনকেই কলকাতায় আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। যে রোগ যৌবনে শরীরে ঢুকেছে, এখন আর মরণকালে তা যাবার নয়। আমি আর সেসব ওদের বলিনি। তাতে ওদের প্রতি আমার টান একটুও কমেনি। বেশ বুঝতে পারছি, এ দুই আড়াই বছরে মানুষের ভালোমন্দ সম্বন্ধে আমার বিচারের মাপকাঠিও বদলেছে'।

'ময়লা ডিপোর কাছের সেই বস্তিটা। যৌবন চলে-যাওয়া হাফগেরস্ত মাখন। যে ছিল 'গ্যাতাদি' বলতে অজ্ঞান। মাঝে মাঝেই উদয়-হওয়া ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানো বনেদি বাড়ির কোনো প্রবীণ লম্পট। শনিবার হলেই পায়ে হেঁটে ফলতায় দে-ছুট তাঁতঘরের হারানদা।'

'ভোরবেলায় বিড়লা জুটমিলের গেটে হাজির হওয়া। ইউনিয়ন আফিসে হয় মিটিং নয় ক্লাস। গীতার প্রতিভা-পাঠশালা। সাজ্জাদদাকে কিছু করা যায়নি, কিন্তু কবিরন খবরের কাগজ অবধি পড়তে শিখেছে। আহ্‌মদ কবিতা বলে, গোলবানু রবীন্দ্রনাথের গান গায়'।

'আমরা চলে গেলে সালেমন তার সঙ্গে গল্প করার লোক পাবে না। সাকিনার জন্যে আমারই কি কম মন কেমন করবে?'

কবিতার বোঝাপড়া পুস্তকে লিখেছেন সুভাষ, 'আমি যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিই

তখনও ঠিক এই ভাবে প্রশ্নটা এসেছিল যে আমি লেখক থাকব, না কর্মী হব? আমি এই সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম যে না, আমি লেখক থাকব না, আমি কর্মীই হব। ...জেলখানায় আমাকে বহু কমরেড বলেছে, 'কেন আপনি লেখেন না? আমরা আপনার লেখা প'ড়ে আন্দোলনে এসেছি অথচ আপনি লেখেন না, আপনার লেখা উচিত।' তাদের এই কথা আমাকে খুব ভাবিয়েছে, কিন্তু তা হলেও আমি জেলখানায় কিছু লিখিনি। বরং আন্দোলন করেছি, রাজনীতি করেছি, কিন্তু লেখা আমি শুরু করলাম এর পরে জেল থেকে বেরিয়ে – যখন আমি বাঙালী চটকল শ্রমিকদের গ্রামে গিয়ে থাকলাম। শ্রমিক আন্দোলন করতে করতেই আমার চারপাশের জীবন আমাকে লেখার দিকে ঠেলে দিল।'

পায়ে সর্ষে ছিল সুভাষের। একসময় ঘুরে বেড়িয়েছেন অবিভক্ত বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। অসাধারণ সব রিপোর্টাজ লিখেছেন প্রথমের দিকে *স্বাধীনতা* ও *জনযুদ্ধ* পত্রিকায় পরে *কালান্তর, সপ্তাহ, আনন্দবাজার পত্রিকা* ইত্যাদি পত্রপত্রিকায়। তেমনই রিপোর্টাজের এক বই নারদের ডায়েরি তে[১৬] *সমুদ্র সাধ* শীর্ষক এক লেখায় রয়েছে এই জেলার কাকদ্বীপ থেকে হলদিয়া যাওয়ার বর্ণনা। বজবজ নিয়ে রিপোর্টাজ ধরনের তাঁর লেখা রয়েছে পূর্বোক্ত *যখন যেখানে* পুস্তকের *বজবজের যে-কোন সকাল, বাবর আলির চোখের মত* লেখাগুলিতে।

ব্যঞ্জনহেড়িয়া সুভাষের জীবন ও সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে।

উল্লেখসূত্র:

১. আনন্দধারা, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা.) লি. ভাদ্র ১৩৮২, পঞ্চম সংস্করণ - জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫। পরে সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে বেরোয় বইটি।
২. চরৈবেতি চরৈবেতি, মিত্র ও ঘোষ, পৌষ- ১৪০৬
৩. চিঠির দর্পণে, আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রি ১৯৯৬
৪. পূর্বোক্ত 'আনন্দধারা'।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. কথার গুণে তরি, কথার দোষে মরি - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অভিজাত প্রকাশনী, কবিপক্ষ, বৈশাখ ১৪০৫।
৭. আনন্দ পাবলিশার্স, মে ১৯৭৯।
৮. হেমন্তর গল্প - হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আজকাল প্রকাশন, বইমেলা ১৯৯০।
৯. এই গল্পটি একাধিক জায়গায় পুনর্মুদ্রিত হয়ে চলেছে আজও।
১০. অল্প দিনে হেমন্তর নাম-যশ-অর্থ হওয়ায় ব্যস্ততা, গলিতে গাড়ি ঢুকবে না বলে সেলিব্রিটি হেমন্তর পুরোনো বন্ধুর বাড়িতে না যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে প্রথম প্রথম অস্বস্তি হলেও, একাধিক লেখায় হেমন্ত সম্বন্ধে এমন কথা বলে গেছেন সুভাষ। যেমন 'হেমন্তর কী মন্তর' পুস্তকে।
১১. মালবিকা চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ, দিবারাত্রির কাব্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংখ্যা, দ্বাদশ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০০৪। অন্য সহায়তা ও গ্রহণ করেছি এই পত্রিকাটি থেকে।
১২. জীবনপুরের পথিক হেমন্ত-ধীরাজ সাহা (আদতে সম্পাদিত এ বই) ওপন মাইন্ড, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯।
১৩. পূর্বোক্ত চিঠির দর্পণে।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. যখন যেখানে – সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বর্তিক, পঁচিশে বৈশাখ ১৩৬৭।
১৬. নারদের ডায়ারি – সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ডি. এম. লাইব্রেরী, বৈশাখ ১৩৭৬।

বিস্মৃত বাঙালি: প্রকাশ কর্মকার
বিশ্বজিৎ সাহু

প্রকাশ শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'ব্যক্ত করা বা হওয়া', 'উদয়', 'বিকাশ', 'প্রস্ফুটন' ইত্যাদি। নাম সার্থক করার সামর্থ্য এই ভূভাগে খুব অল্প সংখ্যক মানুষের কপালে জোটে। তবে কপাল বলতে আমি কর্ম প্রচেষ্টাকে বুঝি। যাঁদের জোটে বা যাঁরা সার্থক করতে সমর্থ হন, তাঁরাই প্রকাশ লাভ করেন; প্রকাশিত হন। প্রকাশ কর্মকার এরকমই একজন ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনটাই একটা দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন আনন্দময় এক শিল্পী এবং সাহিত্যিক।

প্রকাশ কর্মকার। জন্ম কলকাতা। সাল ১৯৩৩। বাবা প্রহ্লাদ কর্মকার ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। প্রকাশ তখন খুব ছোটো। অভাবের সংসার। বাবা আর্টস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সাইকেল চড়ে কাঁকুড়গাছি থেকে চৌরঙ্গিতে আর্টস্কুলে যেতেন। স্কুল থেকে ফিরে অর্গান বাজিয়ে গান করতেন। প্রকাশের বয়স যখন ১৪ বছর তখন বাবা মারা যান; আর ১৭ বছর বয়সে যখন ম্যাট্রিক পাশ করেন, তখন মা। তারপরই চলতে থাকে জীবনযুদ্ধ। একা সৈনিক নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনতরি বেয়ে চলেন।

১৯৫৯-এ সদর স্ট্রিটে ছবির প্রদর্শনী দিয়েই পথচলা শুরু জীবনশিল্পী তথা প্রতিবাদী চিত্রশিল্পী প্রকাশ কর্মকারের। উদ্দেশ্য আধুনিক ছবিকে আর্ট গ্যালারির ঘেরাটোপ থেকে বের করে আনা। শুধু নিজের স্টুডিওতে ছবি আঁকায় মগ্ন থাকেননি, শিল্প নিয়ে রীতিমতো আন্দোলনে নেমেছিলেন প্রকাশ। জনপ্রিয়তা স্বদেশ ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মান, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে। প্রকাশ, জীবনমুখর রমণীয়তায় কখনও চিৎকার করে উঠেছেন 'আমিই শ্রেষ্ঠ' আবার কখনও বলেছেন 'কিছুই আঁকতে পারিনি আমি'। এই বাঙালি চিত্রশিল্পীই ১৯৬৯-এ ক্যালকাটা পেন্টার্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তার আগে যুক্ত ছিলেন 'সোসাইটি অব কনটেম্পোরারি আর্টিস্টের' সঙ্গে। ১৯৬৮ তে 'ক্যালকাটা আর্ট ফেয়ার' শুরু হয় তাঁরই উদ্যোগে। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রাজ্য চারুকলা পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁকে 'মহাশিল্পী সম্মান' জানানো হয়। পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও।

বিংশ শতাব্দীর ষাট দশকে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত চিত্রকরদের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব প্রকাশ। প্রচলিত অর্থে কোনো শিক্ষাগুরু নেই। তাহলে প্রকাশের এই খ্যাতি অর্জন কীভাবে সম্ভব হল; জিনগত? না ঈশ্বর প্রদত্ত? নাকি নিজ কর্মপ্রচেষ্টা? আগেই বলেছি বাবা ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। ইউরোপীয় ইমপ্রেশনিস্টদের মতো সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ নিয়ে ছবি আঁকতেন। ভ্যানগঘ, দেগা প্রমুখের অনুসরণ করতেন। তিনিই প্রথম কলকাতায় ন্যুড স্টাডির ব্যবস্থা করেন। কাঁকুড়গাছি সেকেণ্ড লেনে বিশাল স্টুডিও ছিল। সেখানে অতুল বসু, যামিনী রায়ের মতো শিল্পীরা আসতেন। এমনকি প্রহ্লাদবাবু আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোতে চিত্র প্রদর্শনীর জন্য ১৯৩৯ সালে ব্রোঞ্জ পদকও পান।

কিন্তু সেই অর্থে বাবার কতটা সাহচর্য পেয়েছিলেন প্রকাশ? প্রকাশের ভাষায় – "মা একবার বাবাকে বলেছিলেন, 'তুমি তো অন্যদের আঁকা শেখাও, নিজের ছেলেদের তো একটু শেখাতে পারো?' মায়ের কথা শুনে বাবা আমাকে ডাঁই করা লোহার ছাঁটের ওপর বসিয়ে গরু আঁকা শিখিয়েছিলেন। তখন বাবার শরীর খুব খারাপ।"

১৯৪৬-এ বাবা মারা যাওয়ার পর দারিদ্র্য চরমে ওঠে। মনের জোরে প্রকাশ ম্যাট্রিক পাশ

করেন। তারপর ১৯৪৯ সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। দারিদ্র্যের কারণেই এক বছর পর ছেড়ে দিতে হয় আর্ট স্কুল। ১৯৫০-এ সেনা বাহিনীতে যোগ দেন। উদ্দেশ্য খাদ্য সংগ্রহ। সেখানেও ওই এক বছরই ছিলেন। ১৯৫১ তে বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভবনে চাকরিতে যোগ দিলে তাঁর আর্থিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন আসে। মাইনে হয় মাসিক আড়াইশো টাকা।

প্রকাশের এক দাদা ছিলেন। দেবকুমার রায়চৌধুরী। তাঁর সাথে প্রকাশ ন্যুড স্টাডির চেষ্টা করলেন। কিন্তু নানা কারণে সফল হলেন না। আরেক পরিচিত দাদা দিলীপ দাশগুপ্তের সহযোগিতায় তাঁর স্টুডিওতে ন্যুড স্টাডি শেখেন। এমনও শোনা যায় তিনি যখন আর্ট কলেজে ভর্তি হন তখন কয়েকজন মাস্টারমশাই, তাঁর হাতের কাজ ও অন্যমনা দেখে নাকি বলেছিলেন, 'তোমার দ্বারা ছবি আঁকা হবে না, সময় নষ্ট কোরো না। ছেড়ে দাও।' দারিদ্র্যের কবলে পড়ে প্রকাশ আর্ট কলেজ ছাড়লেও হাতের রং তুলি কোনোদিন নামিয়ে রাখেননি।

সময়টা ১৯৫৯। জায়গা সদর স্ট্রিট। প্রকাশ তাঁর ছবি নিয়ে কলকাতার ফুটপাতে প্রদর্শনী করলেন। বিয়েও করলেন এই সালে। ১৯৬০-৬১ সালে নীরদ মজুমদারের কাছে তালিম নেন কিছু দিন। ১৯৬৯ - ৭০ সালে ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে ফ্রান্স ও ইউরোপ যাত্রা করেন। এরপর তাঁকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৬০-এর দশক থেকে 'ভাঙনের পথে' যে রূপরীতি তিনি গড়ে তুলেছিলেন, সেটাই তাঁর স্থায়ী প্রকাশভঙ্গি হয়ে রইল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আমার ছবি সৃষ্টি হয় আমার মানসিক অবস্থান থেকে, যন্ত্রণা থেকে। রূপচর্চার মতো উপরের সৌন্দর্য্য নিয়ে ছবি আঁকতে পারি না।'

প্রকাশ, ব্যতিক্রমী শিল্পী। চিত্রচর্চার প্রত্যুষ থেকেই গতানুগতিক কলাকৌশলকে ভেঙে তার উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজেকে। আঁকার সময় উন্মাদনার ঘোরের ভেতর ঢুকে পড়তেন তিনি। তাঁর সেই উন্মাদনার চিত্ররূপ যেন দুটি: নারী ও প্রকৃতি। কখনও কখনও দুয়ে মিলে একাকার। তাঁর অঙ্কিত রেখাচিত্রের মুখগুলো বিকৃত এবং ভেঙে চুরে গেছে। এই কারণে, যে, কাকে গ্রহণ করবে এবং কাকে করবে না, এই নির্বাচন তাদের চিন্তায় থাকে না। তাই সব অস্তিত্বকে স্বীকার করে অস্তিত্বহীনতার দিকে হেঁটে চলেছে তারা। ১৯৯৯ সালের একটি অয়েল পেন্টিং-এ দেখি তারই প্রভাব 'এক নগ্ন নারী – পৃথুলা, মাংসল – মাথার কাছে হাত রেখে দুই পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। শুধু তার যৌনাঙ্গের ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা নদীর মতো বস্ত্রখণ্ড ছড়ানো। তার ছড়ানো চুলকে মনে হয়, কালবৈশাখীর ইতস্তত মেঘ। একটি স্তনের বৃন্ত কঠিন হয়ে জেগে আছে। গহ্বরের মতো নাভির আভাস। যে বিছানায় শুয়ে আছে তা সম্পূর্ণ লাল। এই নারীকে আঁকা হয়েছে গাঢ় হলুদ ও মাঝে মাঝে লাল রং মিশিয়ে। ওপর থেকে তার পেটের কাছে ঝুলে আছে জ্বলন্ত লণ্ঠন।' সেই আলোয় নারীর উদরকে মনে হয় পাকা ধানে ভরা একটি খেত। তাঁর চিত্রে রং এর ব্যবহার অর্থবহ ও ব্যঞ্জনাবাহী।

নিসর্গ আঁকতে গিয়ে প্রথাগত ভাবনা ছাড়িয়ে তাঁর শিল্পরূপ প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন – 'মানুষ মিছিল করে যায়। নেতারা ঝকঝকে গাড়িতে ঘোরে। এই অবক্ষয় আমাকে নাড়া দেয়। আবার বাড়ি ফেরার সময় দেখি গাছে ফুল ফুটেছে। পুকুরে ভাসছে পদ্ম। বাড়ির কাছে পাকা ধানক্ষেতে ঢেউ। ভালো লাগে। তখন নিসর্গ টানে।' ১৯৯৮ তে ক্যানভাসের ওপর তেল রঙে আঁকেন একটি নিসর্গ চিত্র। যেখানে ফসলভরা হলুদ মাঠের ভিতর পুকুর পাড়ে একটি খেজুর গাছ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে সূর্যাস্তের লাল আভা ছড়িয়ে আছে। খেজুর গাছের কাণ্ডে মাছরাঙা বসে আছে, পুকুরের দিকে তাকিয়ে। আধখানা সূর্য পুকুরের জলে প্রতিবিম্বিত। খেজুর গাছটিকে প্রকাশ

এমনই আঁকেন, যেন মনে হয়, আমরা অনেক পুরোনো এক পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রকাশ নিজেই স্বীকার করেন, 'আমার ছবির বেশির ভাগটাই নারীর শরীরী রূপ। সেই রূপ ও দেহের আঙিনায় যেতে গেলে আয়নার মতো ফুটিয়ে তুলতে হয় প্রতিটি সূক্ষ্ম অবয়ব। তবে আয়না হলেই চলবে না, দীর্ঘসময় সান্নিধ্য পেতে হবে। তবেই নিখুঁত প্রতিরূপ এঁকে তোলা যাবে। সেখানেই সমস্যার শুরু। সেটা সহজ নয়। ইউরোপের মতো আমাদের সমাজ নয়। বাড়ির একান্ত নিজস্ব স্টুডিওতে নিরাবরণ নারী শরীরকে শিল্পের উপজীব্য হিসাবে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।' সেজন্য প্রকাশকে নিত্যনতুন কৌশলে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয়। সন্ধান করতে হয় অন্যান্য পরিস্থিতির। নিষিদ্ধ পল্লিতে থেকে এবং আরও ভিন্ন অনুষঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেন নারীপ্রকৃতি। ১৯৯৯-এ ক্যানভাসের ওপর অ্যাক্রিলিকে এক নারীর ছবি আঁকেন প্রকাশ। দেখে মনে হয়, সে বারবধূ। গাঢ় লাল পটভূমি। দরজায় হাত রেখে নীল একটি মাংসল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর অন্য হাতে জ্বলছে কুপি। মেয়েটির সারা শরীর জুড়ে নীল রঙের কত খেলা। একটি স্তন উন্মুক্ত। গভীর নাভি দেখা যায়। সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে খদ্দেরের প্রতীক্ষা, নাকি ইতিমধ্যেই সে কাউকে দেখে ফেলেছে? কেন-না ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ঝুলছে।

এ ধরনের গবেষণামূলক ছবির অভিজ্ঞতা অনুসন্ধানে যে তাকে অনেকের অপ্রিয়ভাজন হতে হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এমনকি নিজেকেও তিনি বিলিয়ে দিতেন ছবির স্বার্থে – 'যৌনতার ভুবনে আমরা সকলেই বাস করি। কিন্তু সব সম্পর্ক সেই ভুবনে চিরস্থায়ী হয় না। আমার চার পাশে ইদানীং বহু সুন্দরী জড়ো হন। তাঁদের সম্পর্কে বহু সময় দুর্বলতা অনুভব করি। কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারি তাদের দৃষ্টিতে আমি পিতৃতুল্য সম্মান রক্ষার্থে সরে আসি। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা যৌবনের প্রতি আজও অদম্য আকর্ষণ বোধ করি। যে-কোনো মূল্যে সেই তীব্র দিনগুলি রাতগুলি আমি ফিরে পেতে চাই। কখনো-সখনো রাসায়নিক উত্তেজক ব্যবহারেও আমার আপত্তি নেই। 'পেনাগ্রা' নামের একটি ঔষধ মাঝেমধ্যে সেবন করি। যৌনচেতনার ভূমিকা আমার সচেতন শিল্পকৃতিতে মূল চালিকা শক্তির মতো। তাকে নানাভাবে জাগ্রত করতে চাই। এ এক ধরনের প্ররোচনা যেন। আমি প্ররোচিত হয়ে এই পৃথিবীকে ভোগ করি।' এ প্রসঙ্গে অনেক আগে ১৯৮২ তে ক্যানভাসে অ্যাক্রিলিক আঁকা একটি ঘোড়ার ছবির কথা মনে পড়ে। তার সারা শরীর টকটকে লাল। ক্রমে এই লাল ফিকে হতে হতে কঙ্কালপ্রায় মুখটি কালো রঙে জেগে থাকে। ঘোড়াটির দৃষ্টিতে যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়। তাকে দূর থেকে দেখে এক কৃষ্ণরমণী, যার মুখ মনে হয় ঘোড়াটির পেটের নীচে শূন্যে ভেসে আছে। এই ছবি শুধু নয় প্রকাশের বেশিরভাগ ছবিতেই রেখা ও লাল রং বিশেষ মর্যাদা পেয়ে এসেছে।

ছবি আঁকা নিয়ে পরোক্ষভাবে গৃহত্যাগীও হতে হয়েছে প্রকাশকে। তবুও ছবি আঁকা তিনি ছাড়েন নি। সন্তানের মতোই লালন করে গেছেন সারাজীবন। বাড়ি ছাড়ার কারণটি ছিল অদ্ভুত ধরনের। কলকাতার বাড়িতে বহু বিদেশি যাতায়াত করতেন ছবি আঁকার সূত্রে। তাই বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল তাঁকে সি বি আই এজেন্ট ভেবে সন্দেহ করতে লাগল। হুমকিও দিল। রাতারাতি গৃহত্যাগে বাধ্য হয়ে প্রকাশ শহর ত্যাগ করলেন কিন্তু ফিরে এলেন আশির প্রথম দিকে। তখন ঠিক কলকাতা নয়। বালির সাহেব বাগান।

সমসময় সম্পর্কেও স্টেটমেন্ট রয়ে গেছে প্রকাশের ছবিতে। ১৯৭২ এ আঁকা একটি ছবির ক্যানভাসে তিনি লিখে দেন, 'সশস্ত্র জনযুদ্ধই মুক্তির পথ'। আবার ১৯৯১ এর একটি ছবিরও একই পটভূমি। রঙের ব্যবহার লাল। তার ওপর লেখা 'রিমুভ প্রভাটি বার, স্ট্রিক্টলি রিজার্ভড ফর

থার্ড ওয়ার্ল্ড পলিটিশিয়ানস'। ওই ছবিতে পানোন্মত্ত রাজনীতিকদের দেখা যাচ্ছে। তাদের কারও মুখ মাংসহীন, কঙ্কাল, কারও ধূর্ত পশুর মতো। টেবিলে সাজানো রয়েছে অনেক মদের বোতল। কোনোটির গায়ে লেখা বিজেপি, কোনোটিতে সিপিআইএম, কোনোটিতে কংগ্রেস ইত্যাদি। ছবিটির রং রেখা অবয়বে লেগে আছে ঘৃণা।

ছবি আঁকার পাশাপাশি লেখাতেও ব্যুৎপত্তি ছিল প্রকাশের। সৃষ্টির মূল যাঁর শেকড়ে, তিনি কী কেবল ছবিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন? তিনি তো স্বয়ংস্থপতি, যে সুললিত ছন্দে তিনি লাল, গোলাপি, নীলকে জীবন্ত করে তোলেন চিত্রে; তারই অন্য প্রকাশ কবিতায়।

'স্থপতি আমি
আমার এলানো সংকেত ছিল লাল, শরীরে
আড় ভাঙলে ছিল গোলাপি আর
হাহাকারের সাইরেনে
এঁকেছি মৌনতা
স্পাচুলায়'

একটা সময় প্রকাশ কর্মকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে কবিতার বইও বিক্রি করতেন। সঙ্গী ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ১৯৭৫ থেকে পুরোদমে লেখা শুরু। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *প্রতিমা, জন্য, ঘুমের মুকুটে ছিলে, ক্ষত* । প্রকাশ যেমন অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর ভালোবাসাও ছিল সেরকম। সেখানে কোনো আড়াল অবডাল নেই।

'ভালোবাসায় ছিল ঠিকানা। ওখানেও থাকত
না — গরাদ পাল্লাহীন ওই বাড়িটায়

ওর ঔদ্ধত্যে কত যে লাশ ছিল খণ্ডিত
বুকের পাঁজরের গহ্বরে
ভালোবাসায়।'

আমি শীর্ষকে লিখেছেন আত্মজীবনী। দার্শনিক সত্তা নিয়েই নিজের সকল জীবন কথার অকপট স্বীকার। তার সাথে প্রতিফলিত হয় তাঁর প্রবল জীবন জিজ্ঞাসা।

'এসব স্বপ্ন নয়, কিছু অলীক ভাবনা, হয়তো বা বাস্তব নয় কিংবা বাস্তবের সম্ভাবনার দিকে যাত্রা – এইসব মানবমনের স্বাদ যা সাধ্য বা সাধনায় দোদুল্যমান। এই আমি। আমার এই সময় যেন একফালি রোদ। দেয়াল থেকে দেয়ালে নাচতে নাচতে সে চলে যায় অন্ধকারে। প্রতিদিনের প্রতিপলের ধাপে ধাপে সে মসৃণ। এখন শুধু প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তরে আসে যন্ত্রণা, যেন গভীর অচেনা ভবিষ্যতের দিকে। এখন আমার বয়স চুয়াত্তর। জীবনঘড়ি কোথায় থেমে যাবে তা কেউ জানে না। মনে ওঠে বাসনার তরঙ্গ। একদিকে ক্ষয়, অন্যদিকে বাসনার ক্ষুধা। এ এক অদ্ভুত টানাপোড়েন। ফেলে আসা যৌবনের শক্তি আর আর নেই অথচ মনের মধ্যে কামনার তরঙ্গ। ফলে একমাত্র আশ্রয় আজ স্বপ্ন আর কল্পনা। তারই সূত্র ধরে বড় হয়ে দেখা দেয় নারী। সেই নারী যাকে যৌবনে কাছে পেয়েছি।

এখন সে দূরের। তবু কল্পনায় তাকে কাছে টেনে আনি। বয়ঃসন্ধির আবেগে ফিরে যাই। ... সব শেষে অবসাদ মনে পড়ে, আমি বার্ধক্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছি। বয়স চুয়াত্তর। বুড়ো। ছবি আঁকি।' তিনি লিখেছেন –

> 'নদী যেমন বিশ্বস্ত ছিল আজীবন তোমারই মতো
> সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি। আমাকেও যেতে হবে
> আমাকেও যেতে হবে ওই চরাচরে...।'

কিন্তু রং তুলি ফেলে রেখে এভাবেই যে চলে যাবেন তিনি, তা বোধহয় ভাবা যায়নি। ৮১ তে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর ফেরা হল না। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সন্ধ্যায় প্রকাশ কর্মকারের শারীরিক অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাঁর সেই অলৌকিক-বিভা কোনোদিনই হারিয়ে যাবার নয়। ব্যক্তি প্রকাশ কর্মকার, তাঁর ছবির মতোই স্বতন্ত্র। আচার আচরণ পোশাক-আশাকে, চলনে-বলনে তিনি সবার থেকে আলাদা। তিনি মনেপ্রাণে যা অনুভব করেন তাই করেন। তার সঙ্গে প্রচলিত সংস্কার অনুশাসন, অভ্যাসের কোনো সঙ্গতি বা মিল থাকুক বা না থাকুক। চিত্র রচনার ক্ষেত্রে তাই। মুখোশে মোড়া শূন্য মেকি কৃত্রিম সভ্যতাকে প্রকাশ, ঘৃণা করেন। এর বিরুদ্ধে তাঁর তুলি প্রতি মুহূর্তে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকলার প্রথম দিকের আধুনিক শিল্পী। ভারতীয় শিল্পকলারও আধুনিক পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। প্রকাশ, নানান চিত্রশৈলীর মাধ্যমে শিল্পে নানান পথ খুঁজে পেয়েছিলেন – সেই ধারায় অফুরন্ত কাজ করে গেছেন। দিশা দেখিয়ে গেছেন।

তথ্যঋণ :

১. আনন্দবাজার পত্রিকা
২. আজকাল
৩. প্রতিদিন
৪. অন্যমন, প্রকাশ কর্মকার সংখ্যা, ১লা ডিসেম্বর ২০১৪
৫. উইকিপিডিয়া।

পতনশীল কবিতাগুচ্ছ

অভিষেক দত্ত

১.
জ্বর যেটুকু বুঝেছে এই শরীর,
ততটা বোঝেনি তোমার আঙুল।
অজান্তেই ঝরে যায় ফুল।

২.
বিকেলের পতনশীল হাওয়া,
অভ্যাস করে রোজ মিথ্যের মেনে নেওয়া।
একা একা।

৩.
যেসব ছাতা হারিয়ে এসেছ পথে,
তারা আজ কাদের ছায়া দেয়?
ভেবেছ কি?

৪.
সমস্ত না-বোঝার পাঠ রেখে যাই,
সিঁদুরে সিঁদুরে মেঘলা হয়ে যায় ঘর।

৫.
যৌথদুপুর নিভে এলে তুমিও একদিন
হাওয়ার আত্মীয় হয়ে যাবে।
আমি জানি
আমরা জানি।

৬.
মৃদু চৌকাঠ।
ওপারে অলীক শুশ্রূষা।
অসুখের বানান ভুল হয়ে যায় বারবার।

৭.
চেনা রোদ্দুরের মতো মুখের আদল।
বিষণ্ন সানগ্লাস গড়িয়ে দিচ্ছে
কুসুম আলোর ঝাপসাটুকু।

যাপন

তমোঘ্ন সরকার

মাঝরাত্তিরে হতাশ কবি
কী লিখতে চায় জড়ানো অক্ষরে
যখন সমস্ত কিছু আশপাশে
কালোরাতের চারকোল পেন্টিং
ছাড়া কিছু নয়
সময়, হাইওয়েতে ছুটে যাওয়া
গাড়ির পিছনে ফেলে যাওয়া
নিস্তব্ধতার সমান
ভালোবাসা কাচ-গেলাসে
আলো লাগা
ঝলমলানো এক মুহূর্তমাত্র, বাকি
ঘৃণা লেগে থাকে বিছানার চাদরে
প্রতিদিন শোবার সময় মিশছে শরীরে।
ঘৃণা করা নিজেকে। এই কবিতাকে
তারপরে অসহ্য গতিবেগে সমস্ত কোণে
পৃথিবীর হতাশা ছুটে যায়।
নিঃসীম কালো।
এরপর কী থাকে, আর? প্রায় কিছুই
থাকে না, নির্লিপ্ততা ছাড়া।

বার্ধক্য

দীপায়ন সাহু

এক

হঠাৎ করে পুরানো সকাল আর ফেরে না।
প্রতি বছর একটু করে উষ্ণতা হারায় শীত।
কুয়াশার ভিতর ঘোড়া ছুটিয়ে এখন
অন্তর্দন্দ্বের মধ্যে ঘুরপাক খেতে হয় শুধু।

দুই

সদ্য ঝরা গোপন ফুলের ওপর শুয়ে মরে গেছে প্রিয় ঈশ্বর
আমি পৌঁছাতে পারিনি।
শুধু শীতের হাওয়ায় উড়ে আসা তার ছাইরং পালকে
রক্তযৌবন লেগে ছিল দেখে আমি বুঝে গেছি ...

তিন

...অস্পষ্ট কুয়াশার পূর্বাভাস, ধুলো ক্ষুরের গতি,
ঝরতে গিয়ে হাওয়ায় ক্ষণিক আটকে থাকা ফুল —
সব কিছু ভুলে নিজের পায়ের বেড়ি ধরে বিরক্তি আর পাপবোধে
এখন থেকে ডুবে যাবে প্রতিটি শীতরাত।

যে অনুভবে আপন মনে

হরেকৃষ্ণ দে

ঠিক কীভাবে দেখেছি তা বলতে পারব না
শুধু প্রজাপতির বসার ভঙ্গিমায় ফুলের সৌন্দর্যের মতো
মনখানা আটক রেখে হারিয়ে গেছিলাম

কোনোদিন যাতে না জানতে পারো তাই
মনের কার্নিশে দুটো চোখ অভাবী দৃষ্টির আকাশে মেলে ছিলাম
নীলের ভেতর ঘন নীলের মন দিয়ে আকাশ বানাতে চাইছিলাম

হঠাৎ দু-ফোঁটা বৃষ্টির পিপাসায়
হাত মেলে শুধু অনুভব করছিলাম আপনার চেয়ে আপন মনটাকে ...

মিথকথা

গোবিন্দ মোদক

দুপুর থেকে গড়িয়ে গেল বিকেল
বাতি হাতে সন্ধ্যা ঘোষণা করল সন্ধিক্ষণ
কাঁসরঘন্টার শব্দ, আজানের সুর
আর গির্জার আলো
একে একে প্রতীয়মান হল পাহাড়ি গ্রামটার
আনাচেকানাচে

পিলসুজ থেকে উপচে পড়ল তেল
আর মরণোন্মুখ কিছু পতঙ্গ
প্রদীপের আলোয় পুড়তে থাকল
তাদের ঘ্রাণে এল পোড়া তেলের গন্ধ
তাদের পথ ফুরিয়ে গেল জীবনপথের মাঝেই
ঘুমিয়ে পড়ল নৈঃশব্দ্য ভরা বাতাস
শুধু জেগে থাকল স্বপ্নময় এক নিশুতি রাত
আর কষ্টকল্পিত মিথকথা।

শৈশব

শ্রীপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়

হাত ছুঁয়ে থাকি চলো, একবার সেইদিকে যাই।
সেখানে সন্ধ্যামণি ফুলে লেগে আছে মেঘ ভাঙা
বিকেলের রোদ। বনের চন্দন গন্ধ। যেদিকে
নিয়েছে বাঁক লালরঙা ফড়িং আর জোনাকি ধরার
ছোটোবেলা। ছাদের আলসে জোড়া থোকা থোকা
যুঁইফুল জোছনার মত সাদা, অপরূপ হাওয়া বয়ে যায়।
চাঁদের শোভাটি দূরে, কাছেই যে জল।
মায়ের মুখের কথা মেঘ হয়ে আকাশে জমেছে।
সেই জলে ভিজে আসি, বড় বেশি শুষ্ক এখন দেহ।
তুমিও তো ক্লান্ত এখন। চলো হাত ছুঁয়ে থাকি
একবার সেইদিকে যাই ...

আজও

সুমিত মোদক

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস,
তুমিই আমাকে করে তুলেছ পুরুষোত্তম,
মহাভারতের মহানায়ক;

অথচ, আমি সেই গো-রাখাল ...

আমার শৈশব, আমার কৈশোর, আমার শ্রীরাধিকাকে
পিছনে ফেলে নিয়ে চললে
মথুরা নগরে;

করে তুললে চতুর-ছল-কূট ...

বৃন্দাবনে পড়ে থাকল সরলতা ...

সেই থেকে আজও কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে
পার্থসারথি হয়ে বলে চলেছি —
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ...
আজও
কৌরব আর পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়ে চলেছে;

আর তুমি একের পর এক লিখে চলেছ
যুগান্তরের ভারত
মহাভারত।

অমন করে ঝাঁকিও না

রাখী সরদার

আমাকে অমন করে
ঝাঁকিও না আর, স্তব্ধ হতে দাও

যতক্ষণ মগ্নকাল
যতক্ষণ চাঁদের সৃজন
মাটির ডালায় পড়ে থাকি

তুমি নির্দ্বিধায়
তুলোর প্রাসাদে নিদ্রা যাও
সঙ্গীহীন সুখময় রাত।

এই একটু পর ভোরের বিভ্রমে
মহামারী নামবে এ দুচোখ ছেয়ে
আবারও সেই একঘেয়ে ফোঁপানি। ক্লান্তির পসরা

কোথাও দেখি না
নিঃস্বার্থে জাগায় কেউ
আলো ফুটেছে তো প্রত্যাশা আর প্রত্যাশা ...

স্ববিরোধ
বঙ্কিমকুমার বর্মন

এই তো একটিই মাত্র জীবন তার ফাঁকে ফাঁকে কত দুপুর
অসম্পূর্ণ থেকেছে বরাবর পৃথিবীর কোনো অচেনা অ-সুখে
স্ববিরোধে ভেসে গেছে পাতার আড়ালে বয়ে যাওয়া শোকনদী
কত সন্ধ্যা নামল গতিপ্রবাহে ও তার শাখাপ্রশাখার ডালে

কান্নার নীল জলে ভাসিয়েছি আমার অলৌকিক জলযান
তাতে পূর্ণতা পেয়েছে জীবনের একেকটি রুলটানা কাগজ

মাছরাঙার ডানায় ডানায় মিশে যায় রাধাচিহ্ন মন
যার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল শিশিরের অগোছালো খুনসুটি

আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে প্রেম গড়িয়ে পড়েছে বহুবার
রেশমের মতো চুলে হারিয়ে গেছে কত সন্ধ্যার উপবন
তাতেও তরুণ জলপাতাটির রোদ্দুর রঙের অভিমান
বারবার নিজেকে ছুঁয়ে জাগায় অলৌকিক শিহরণ।

ত্রিকোণ
রাজীব পাল

১.
প্রত্যেকটা প্রজাপতি আসলে পাখা সর্বস্ব
শুঁয়োপোকা অতীত
পাতারাই শুধু আগলে রাখে মায়ের মতো
২.
শিকড়ের ব্যথা বৃক্ষই জানে, মানুষেরা নয়
বুকের বাতাস এবং ডানার রোদ
কমে এলো, মাটির কথা ভেবেছে মানুষ?
৩.
মাটির অসুখ বিসুখ হলে উর্বরতার আয়ু
কমে আসে, চাষিরাও জানে
লাঙলের ফলাই শেষ কথা নয় চাষবাসে

মানুষ
সিদ্ধার্থ সিংহ

এখন আর মানুষ মরে না।

মরলে বি জে পি-র লোক মরে
তৃণমূলের লোক মরে
সি পি এমের লোক মরে

এখন আর মানুষ মরে না।

এ রাজ্যে মানুষ থাকলে তো মরবে!

লেগপিস
সন্দীপ রায়

মুরগির লেগপিস চিবোতে চিবোতে সজলদা বলেছিল
লেগপুলিং করা থেকে ভোজনরসিক হওয়া ভালো

আমি দেখছিলাম মশলা মাখানো লেগপিসটি
কেমন সুকৌশলে চিবিয়ে যাচ্ছেন সজলদা

আমি দেখছিলাম খোঁড়াবিশু ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে
কেমন রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে

বিধুকাকা দুপুর না-মেনে চলে যাচ্ছে অমৃত সন্ধানে
লজ্‌ঝড়ে খাটের ঝরঝরে পায়া কাটিয়ে দিচ্ছে মায়া

আমি দেখছিলাম অতনুর পা এখনও আটকে আছে
ব্রততীদের চৌকাঠে, এগোতে পারছে না

আমি দেখছিলাম মুরগির গা থেকে
খসে পড়া শুভ্র পালকে ছেয়ে যাচ্ছে
পুরুষ্টু পৃথিবীর তলপেট ...

সন্তাপ

রাজদীপ ভট্টাচার্য

এক দীর্ঘ বিবাহজীবন ভেঙে যাবার আগে
প্রথম দিনগুলির কথা মনে করা যেন বাধ্যতামূলক।
সেই আলোয় পুড়ে যাওয়া চোখ,
রহস্য রোমাঞ্চ কথা রাত জেগে পড়া।

তারপর ফুঁসে ওঠে অশ্রুজল, কাঁদে ওই বকুলগাছও
বলে, ভুলে যাও, সেই এক কথা বারবার!
সময়ের সেঁক দাও ব্যথার কোটরে
প্রতিদিন, প্রতিটি দিনের সাথে বাঁচো।

বালিশ বিসর্গ হলে

বিকাশ দাশ

এপারে আমি আর ওপারে তুমি
আমাদের মাঝখানে একটি বালিশ
কেমন বিসর্গ হয়ে আছে।
দন্ত্যবর্ণের তৃতীয় আর কণ্ঠ্যবর্ণের দ্বিতীয়
আমি আর তুমি এবং আমাদের দাম্পত্য।

আমরা চুপ শুয়ে আছি
কিছু সন্তাপের উপর তা দিয়ে
বালিশের কোনো তাপ নেই; যতটা অসূয়া
ঠিক ততটাই ক্যামোফ্লাজ অসুখ
ঠিক ততটাই অন্তর্ভেদী।

এপাশে আমি আর ওপাশে তুমি
মাঝখানে বালিশ কেমন
অযোগবাহ খেলছে কৃপণ।
'দুঃখ' বললে ততটা দুর্বোধ্য লাগে না
বালিশ কেবল বিসর্গ হয়ে দুঃখ বোনে
আমাদের রাত কাঁথায়।

কিছু সমাধান পেলে?

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

বাতাস ঘুরছে নাকি মাথাটা ঘুরছে কিছু বোঝার আগেই
সেরিব্রাল অ্যাটাক, কানুর।
মানুষ হাঁটছে নাকি সময় হাঁটছে এটা জানার আগেই
ভানুকে যেতেই হল জেলে
তার সব গবেষণা ফেলে।

বাতাস ঘোরেনি, জানা গেল।
মানুষ হাঁটেনি জানা গেল।
কানু বা ভানুকে কেন তাহলেও যেতে হল
হাসপাতালে, জেলে?

নিরঞ্জন, চুপ কেন?
এর কিছু সমাধান পেলে?

নির্বাসন

পিন্টু পাল

দৌড় চুষে খাচ্ছে হাঁপানো দুপুরের নোনাঘাম
নখাগ্রের তীক্ষ্ণগর্জনে ঠোক্কর কাটছে আয়নাভাঙা ডিঙি

নোয়ানো স্রোতের মতো মৃতকাদা
আধপোড়া ইশারায় লিখে দিচ্ছে মিলনের শেষ ছাপ

দুহাত উজাড় করে কাঠপোড়া ছাই জড়িয়ে ধরছে পৃথিবীর তাপরং
দুহাত উজাড় করে ক্রন্দনরত বিকাল চুম্বন করছে অজস্র আতঙ্কগাছ

বিশ্বাস সতর্ক হও
চলো, যে যার মতন করে একা হাঁটি সমুদ্রতীরে

যমজমি ছড়িয়ে দিচ্ছে নির্বাসনের আভাস

তোমাকে খুঁজতে প্রেম, স্নায়ু ছুঁয়ে, জলস্রোতে অসাড় চুম্বন দেগেছি

আকাঙ্ক্ষা

গৌতমকুমার গুপ্ত

আকাঙ্ক্ষার ভেতরে ভরে নিয়েছি শীতল জল,
বিন্দু বিন্দু বায়ুস্তর। আকাশের রোজনামচায়
বেশ দেখতে পাই তোমাকে, নক্ষত্র যেমন আলোর উদ্ভাসে, পরিকীর্ণ হয়।

দেখা হয় সেই সব হরিণী বালিকার, বেণী দোলে বুনো ফুলে। চমকে ঘাই তোলে কিঞ্চিৎ চপলতায়। কেউ কেউ বিদুর খুঁজে পায়। প্রেম প্রণয় খুলে ফেলে স্বরবর্ণ। বেণী খুলে এলোকেশী হয় সবাক কৃষ্ণময়।

নিজের আত্মপ্রবণে আমি তো একাকার। সেই পরিণতি বুঝে মন দিয়েছি সেচপ্রবৃত্তির। চাষবাসে স্বর্ণহরিদ্রা খেলে সবুজ সহবতে। মরমী কাঙ্ক্ষায় ভালোবাসি দেহবাস। আহা, সুরভিত হেম।

বসবাস থেকে প্রত্যহ ভরে নিই আগুন। নিজেকে চাগার দিই প্রবল উত্তাপে। আকাঙ্ক্ষা যদি উন্মাদ করে ঘোড়দৌড়ে, বল্গায় মারি টান। ধুলোয় ধূসরে চিনে নিতে পারি আমার সাবেক পিছুটান।

আকাঙ্ক্ষার এপারে একটি সাধারণ পুষ্করিণী। ফোটে না শালুক বা কোকনদ। বহে না কাকচক্ষু প্রবাহ। আর ওপারে আমার সকল সুখের সর্বনাশ। আমার স্বরচিত প্রদাহ-গরল।

অপেক্ষা

দীপশেখর চক্রবর্তী

যে চলে গেছে, সে একটা অপেক্ষা রেখে গেছে
তাই তার কোনো অবহেলা নেই
আমি কারও অপেক্ষাও করি না
শুধু রোদে মাদুর পেতে আকাশ দেখে দেখে ভাবি
আমার এই একা থাকার একটা দারুণ গন্ধ বা রং আছে
অথচ মাঝে মাঝে মনে হয় কারও অপেক্ষা থাকলেও মন্দ হত না
কাউকে যদি ডাক পাঠাতুম... এই এসো আমার ঘরে,
তারপর চলে যেও নয় একটা অ পেক্ষা রেখে যেও
তুমি কী জানো না? অবহেলা পেতে পেতে
নিঃশব্দে কেমন মরে যায় মানুষ!

প্রজাপতি
রানা সরকার

শেষ রাতের আকাশেও তোমায় খুঁজেছিলাম।

এখন আমার শরীর জুড়ে একটা গ্রাম।
একটা মেঠো পথ চিরে
দুই প্রান্তে মাটির ঘর।

পাখিরা উড়ে আসে
পাখিরা উড়ে যায়
সন্ধ্যা নেমে আসে

প্রজাপতি মাটির গৃহে প্রবেশ করে।

আমার দেহ জুড়ে শুধু সূর্যস্নানের ঘাম
আসলে প্রত্যেকটা রোমকূপ উদ্বাস্তু গ্রাম ...

লবণ ও অনুঘটক
ফিরোজ আখতার

অপেক্ষাকৃত বেশি লবণ ছিল তার ঘামে
চোখ জ্বলত, ভয়ে ছিল সে খুব
একদিন অন্ধ হয়ে যাবে।

তারপর
সত্যি সত্যি একদিন অন্ধ হয়ে গেল সে
চোখদুটো অন্তর্ঘাত করল
অনুমতি নেবার প্রয়োজন
বোধ করেনি একবারও

শুধু নির্মল হাসির টুকরোগুলো
অনুঘটকের কাজ করে এখনও

ভয়

কল্লোল সরকার

এখনই তো গর্জে ওঠার সময়
প্রস্তুত ছিল কলম,
একটাও আঁচড় না-কাটা খাতার পাতা
অক্ষর-শব্দগুলো অ্যাটেনশন সারিবদ্ধ প্যারেডে
তবু গর্জে ওঠা হল না।

মনের মধ্যে ছিল ভয়ঙ্কর ভয়
সেই ভয় যার ফলে
মানুষের হাত-পা পেটের ভেতরে আপনি ঢুকে যায়
বুকের ভেতরে একটা লাথি খাওয়া
ঘেয়ো কুকুরের কান্না শোনা যায়।

সব তর্জন-গর্জন হল অসার
লেখা গেল না একটাও অক্ষর
শুরুতেই প্রাণ গেল
একটা প্রতিবাদী কবিতার।

মায়ামানুষ

রাহুল ঘোষ

মানুষটার খুব কষ্ট ওকে একটু শাস্তি দাও।
শাস্তি দেওয়া ওকে একটু প্রয়োজন।

এখন যে পরিমাণে গরম পড়ছে তাতে জল
আর আমাদের ঠাণ্ডা করতে পারবে না
আমাদের গরম শরীর জুড়োতে সময় লাগবে।

মানুষটার আয়ু বেশিদিন নয় ঠিকই
তবু বসে আছে চুপচাপ অপেক্ষায়
কখন দেখা যাবে মহানন্দা
আমাদের মরুভূমি কখন হয়ে উঠবে সবুজ।

ভয় পাওয়া বুকে থুতু দিতে আসবে চিরন্তন প্রেমিকা
সব কিছু সে মুছে দিতে বলবে।

ভিক্ষুক

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

অপেক্ষার শরীর
একটা ডাক চাইছে
বেরোনো হচ্ছে না

নদী সামনে
এত শুকনো সে
মায়া বুনি

অরণ্যের ছবি
আর ছায়ার পথ
হারিয়ে রোদ
একটি গান।
খুব পুরোনো পাতা
বাইছে জোর

জল এলে
জানালা খোলা থাকবে
হে আনন্দ

নীরব হবো

পাপিয়া চক্রবর্তী

তোমাকে কাছে পেলেই শব্দেরা পেয়ে বসে
আর তোমার বাঁকা ভ্রূ বিদ্রুপ ছুড়ে বলে
'বেচাল বাচাল'

আমি মাথা নত করে, শব্দের শবের মাঝে
এবার নীরব হব

দেখো ঠিক চলে যাব —
চলে যাব কোনো এক নিঃশব্দ নগরীতে

প্রাজ্ঞবটের কাছে খোঁজ নেব
শিকড়ের গভীরতার

মাটির মতো মূক ও বধির হব

আমার বলা কথাদের ধ্বংসাবশেষে
কয়েকটা ধূপ জ্বেলো আর আড়াল করে রেখো
জ্বলন্ত মোমবাতির কান্না

তুমি তো আকাশ আমি হাঁটু ভেঙে
তোমার পায়ে রেখে দেব –
কেটে ফেলা বাগ্ময় জিভের আবেগ

তুমি পা দিয়ে মুছে দিও রক্তের দাগ।

ঝরনা

পারমিতা ভট্টাচার্য

ঝরনাজলের কাছে মুখ নিই, পাখিদের
ডাক শুনে মনে হয় মায়াপারাবার ...
বাকি পথে হেঁটে যাবে বিষাদ আবার!

ধু-ধু করে পুড়ে যাচ্ছে গাছ, শালবন
ছায়াগুলো আর্তনাদে পাথরে ঝাঁপালে
জলের শৃঙ্খলা ভেঙে দাও ...
রাত্রি থেকে পতঙ্গের গান চুরি করে, যদি
ফিরি এ গভীর বনপথ —
উদ্দালক এইবার আগুনে পোড়াও ...

ইতস্তত হাওয়া নয় আর
শরীরের বাঁকে বাঁকে বেড়ে ওঠা যত দ্বিধাগাছ
তুমুল ঝড়ের সাথে যাক উড়ে যাক
পিছল পাথর জুড়ে ঝরনা আসুক নেমে,
পথ নিক নিজেকে খোঁজার!

নীলহরিণের দিন

পল্লব গোস্বামী

মেঘ মেঘ তোমাকে দেখে
বৃষ্টি হতে চেয়েছে যে পাখি,
আমি তার দু-ডানায়
চিরবসন্ত এঁকে দিয়ে
ভাবি আর ভাবি!
কীভাবে কাজুফুলের হাওয়া
বদলে দিয়েছে
তোমার পথের প্রপাত!

হলুদ জলে ভেজানো উঠোন,
পুরানো কাসুন্দি পাতা, জল
অনেকদিন ভাবো না আর
একটা নীলহরিণ
তোমার বুকে টোকা দেয় মাঝে মাঝে,
আমি দেখি
পিগমি সুন্দরীদের বুকে
তুমি মিশে যাচ্ছো,
যুযুধান হাউই হয়ে।

বুকের ব্যথায় চাঁদ ডুবে যাচ্ছে

খুরশিদ আলম

এযাবৎ পৃথিবীর উপর যে বৃষ্টিপাত হয়েছিল তার কেউ হিসেব রাখেনি
বিস্তীর্ণ মাঠ আর বিষাদ যেন একরকম বিষয় হয়ে উঠেছে
অনন্ত আশ্রমের দিকে এগিয়ে যাওয়া শহর বারবার বেঁধে দিচ্ছে তার সীমারেখা
উপচে পড়া কান্নাগুলি মুছে দেবার আর কোনো জলাশয় নেই
উদাসীন হাওয়ায় ভাসছে আমার পাণ্ডুলিপি
বুকের ব্যথায় চাঁদ ডুবে যাচ্ছে
একফোঁটা বৃষ্টিবিন্দু নিয়ে আমাদের অনন্তকাল
অযাচিত উনুনের ধোঁয়ায় গা পুড়ে যাচ্ছে

সুখী পাতা

শান্তনব চৌধুরী

মহানিমের শুকনো পাতা
একটি দুটি করে খসে পড়ে
বাতাসে ঘুরপাক খায়
কখনও খাড়া হয়
কখনও আড় হয়।

যৌবনের জলতরঙ্গে
ত্রাতা ডাকে
অনাহত শব্দ ডাকে
যাবার আগে
সুখভোগ করে প্রাকৃতিক নিয়মে...

জলের নামতা

রুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন্ত শহিদ হয়ে যাচ্ছে
খেলার মৌসম
ওয়াড্রোবে সারি সারি ঝোলানো অন্তর্বাস
চুপিচুপি মেপে চলে মনরোর বুকের খাঁজে লটকে থাকা
নীলপদ্মের ফুটেজ
আমি বহির্বাসের উল্টোপিঠে নতুন শব্দ বুনি
জলের নামতায়
আপেলের খোলা নাভির পাশে
ইচ্ছের মৌসম
জুয়া খেলছে ইস্কাবনের উজির
আমি জলের সুতো দিয়ে মনসুন সেলাই করি
ডেকে দিই ভালোবাসার মুহূর্তগুলোকে
আলোর বৃত্তে দৃশ্য হয়ে ওঠে প্রথম চুমু
চমকে ওঠার মুহূর্তে
বৃষ্টির ধ্বনিসম্মোহন লিখে রাখে অন্তর্বর্তী পঙ্ক্তিতে
একটু অবসরের মৃদু হাওয়ায় দুলে ওঠে বারান্দা
পুরোনো গানের দু-এক কলি জীবন
মৃত্যুর জেরক্স কপি হাতে নিয়ে সম্মোহিত বসে থাকে বারান্দায়
আর দূরে পাশাপাশি হেঁটে যায় জীবনের লম্বা ছায়া

নিভু আলো

অভিজিৎ মান্না

একটা আস্ত রোদ ধরার চেষ্টায়
বিবর্ণ হলো ডালিম গাছের পাতা।
এভাবেই শুরু পৃষ্ঠদেশের যন্ত্রণা।
হয়তো বিঁধে গেল
ভাঙা পেয়ালায় বাসি চাঁদ সাঁতার কাটে
সূর্য খুঁজি হ্যাংলার মতো।
সাবেকি চাওয়া সত্যিই অর্থহীন?
আলপথও কিছু বলতে চায়।
বড্ড রুগ্ন মন। বিস্বাদ বালুতট।

আমার নিজের বলে যেটুকু আছে

চন্দন বাসুলী

বাড়ির আলমিরাতে আমার নামে কোনো স্মারক নেই।
ফাইলে যত্নে রাখা কোনো শংসাপত্র নেই
আমার নামে দামি প্রকাশনার কোনো বই নেই!
আমার নিজের বলে যেটুকু আছে ...
বুকের কার্নিশে জমে থাকা কিছু নোনতা কষ্ট
প্রেমিকার দেওয়া আদরমাখা দিনের আনন্দ
বাবার মাথার ঘামে আঁকা এক মানুষের সৎ মানচিত্র
মায়ের সরলতা ভরা শরীরে এক পৃথিবী নিরেট সুখ!
এগুলোই মাঝে মাঝে নদী হয়
আমার উপর বয়ে যায়
কুল কুল শব্দে আমাকে বলে যায় একটা কবিতা
যেখানে কোনো বৈষম্য নেই
কোনো ভেদাভেদ নেই
কোনো অবহেলা নেই
বলা আছে মেহনতি মানুষগুলোর মাটির সাথে
আনন্দে বেঁচে থাকার কথা;
বলা আছে বিশুদ্ধ ভালোবাসার কথা!

বেদনার বিষয়ক

আশীষ মাহাত

প্রথমে তোমার ছবি দেখে লিখলাম
ভাড়াটে হাসি,
চুম্বকত্বের আকর্ষণ,
অক্ষচ্যুত প্রাণি,
অন্ধ চোখ, যে তোমার ঠোঁটের তিল লক্ষ করেনি।

তারপর তোমার পাশে বসে যেই লিখলাম
শীতের কথা
তুমি গায়ে চাদর দিয়ে ঢুকে পড়লে
সাপের খোলসে
আর আমি জন্মাবধি বোবা
বেদনায় মুখ ফোটে না।

জন্মদাগ

রূপক চট্টোপাধ্যায়

আমার কোনো জন্মদিন নেই,
মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পথ,
গাঢ় অন্ধকার থেকে
বিচ্ছিন্ন বিষাদের ছায়ায়
জন্মদাগ খুঁজে খুঁজে হেঁটে যাই!

বিশ্রাম বসে থাকে গাছের নীচে,
স্নিগ্ধ ছায়ায় তার গন্ধরাজ শরীর

সে শরীর গ্রহণ করি না আমি
চুমুক পর্যন্ত এসে থেমে যায়
বিপন্ন চোখের ঘোলাটে মাঠ
গাভীর স্তনের মতো নেমে আসা মেঘ,
আমার জন্মবৃন্ত ছিঁড়ে
ছিটকে পড়া বাবলাফুল
মৃত্যু বলয় ভেঙে ভেসে আসে

আমার জন্মদাগ
শুধু ফসলের মাঠ থেকে
ভেসে আসা সন্ধ্যার মহাকাব্য শোনে ...

অমলেন্দুবিকাশ দাস-এর কবিতা

এক

ধূপের গন্ধে মন ভালো হয়ে যায়
ধূপ জানে না
দহনেই তার আত্মপরিচয়।

দুই

গাড়ি সাঁক সাঁক করে বাঁক পার হয়ে যায়
রাতের যাত্রী পাশ ফিরে চায়
জোড়া চোখ জ্বলে ড্রাইভার-সিগন্যাল ইশারায়।

তিন

রাত জানে না কোথায় লুকিয়ে ভ্রমর
রাত্রির মধুরিমা
হাজার তারার ভিড়ে একটি তারাই হাসে।

'দ্য ডেথ অব দি অথর': সাহিত্য সমালোচনায় ফরাসি বিপ্লব

পাপড়ি মিত্র

'...the birth of the reader must be at the cost of the death of the Author'

'লেখকের মৃত্যুতেই পাঠকের জন্ম' — ফরাসি সাহিত্য সমালোচক ও সাহিত্য তত্ত্ববিদ রঁলা বার্থ (১৯১৫ - ১৯৮০) কথিত এই উক্তিটি বিশ শতকের মধ্যভাগে সাহিত্য সমালোচনার জগতে এক নতুন পথের সূচনা করে। তবে আপাত দৃষ্টিতে উক্তিটিকে সোনার পাথরবাটির মতো অবাস্তব বলে মনে হতে পারে। যদি লেখকের মৃত্যু ঘটে তবে লিখবে কে? আর যদি লেখাই না-থাকে তাহলে পাঠকেরই বা প্রয়োজন কী? যুক্তিবাদী মননে এমনই নানাবিধ জিজ্ঞাসা তৈরি হয়। এই জিজ্ঞাসাগুলি উক্তিটির সারবত্তা বা গ্রহণযোগ্যতাকে সন্দিগ্ধ করে তোলে। ফলে উক্তিটি অনেকটা ধাঁধার মতো রহস্যময় হয়ে ওঠে। এই ধাঁধার মর্মার্থ অনুধাবনের জন্য আমাদের উক্তিটির উৎস অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত রঁলা বার্থের আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রবন্ধ 'দ্য ডেথ অব দি অথর' (The Death of the Author) এর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

রঁলা বার্থের প্রবন্ধটি আলোচনার আগে বিশ-শতকের ইরেজি সাহিত্য সমালোচনার ধারাটি একটু দেখে নেওয়া যাক। বিশ শতকের আগে সাহিত্য সমালোচনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্য রচনার সমসাময়িক প্রেক্ষাপটকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। ১৯২০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে জন ক্রো র‍্যানসম, ক্লিনিথ ব্রুক , উইলিয়াম এম্পসন , আই এ রিচার্ড, এফ আর লেভিস, রবার্ট পেন ওয়ারেন, টি এস এলিয়ট, অ্যালেন টেট, আর পি ব্ল্যাকমুর, উইলিয়াম কে উইমশাট, বার্ডস্লে প্রমুখ সমালোচকদের হাত ধরে সাহিত্য সমালোচনার রঙ্গমঞ্চে নিউ ক্রিটিসিজম (New Criticism) স্বমহিমায় আবির্ভূত হয়। এই সমালোচকেরাই প্রথম সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখকের জীবনী ও সাহিত্য রচনার সময়কালকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে সাহিত্যের অন্তর্বর্তী উপাদানগুলিকে অর্থাৎ বাক্য, শব্দ, অলংকার, ছন্দ, যতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে লেখকের ব্যক্তিজীবন ও রচনাকালের উপর ভিত্তি করে সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করলে কখনোই আমরা সাহিত্যের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারব না। কারণ, সে ক্ষেত্রে লেখকের নিজস্ব অভিমত ও উদ্দেশ্য সর্বদা সাহিত্যের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণকে প্রভাবিত করবে। নিউ ক্রিটিকদের মতে সাহিত্য কখনোই লেখকের চিন্তাভাবনার পরিপূর্ণ প্রকাশ হয়ে উঠতে পারে না। অনেকক্ষেত্রেই লেখক যে ভাবনা ও চিন্তনকে মাথায় রেখে তাঁর রচনা শুরু করেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টি সেই ভাবনাও চিন্তনের পরিপূরক না-হয়ে অনেক সময় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকার ধারণ করে। তাই তাঁরা মনে করেন সাহিত্যপাঠ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখকের জীবনী এবং তাঁর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য না-দিয়ে আমরা যদি সাহিত্যের অন্তর্বর্তী উপাদানগুলিকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি, তবেই আমরা সাহিত্যের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হব। নিউ ক্রিটিকদের চিন্তাভাবনায় আবার রুশ রূপবাদ (Russian Formalism) -এর প্রভাব লক্ষণীয়। নব্য সমালোচকদের মতো রুশ রূপবাদী তাত্ত্বিকরাও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে লেখকের পরিবর্তে সাহিত্যের ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। নিউ ক্রিটিসিজম সাহিত্য সমালোচনার যে নতুন ক্ষেত্র নির্মাণ করেছিল সেখানেই অঙ্কুরিত

হয়ে উঠেছিল স্ট্রাকচারালিজম (Structuralism) বা গঠনবাদ। ১৯৬০ সালে ফ্রান্সে প্রথম গঠনবাদের আবির্ভাব ঘটে। সুইস ভাষাবিদ ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুর-এর ভাষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গঠনবাদ গড়ে ওঠে। ক্লদ লেভি স্ট্রাউস, জোনাথন কুলার, রোমান জ্যাকবসন, ভ্লাদিমির প্রপ, টেরেন্স হক, জেভেটান টোডোরভ, আলজিরডাস জুলিয়েন গ্রিমাস এবং রঁলা বার্থ প্রমুখ হলেন বিশিষ্ট গঠনবাদী সমালোচক। গঠনবাদীদের মতে ভাষার মতো সাহিত্যেরও একটি নির্দিষ্ট গঠনগত পদ্ধতি ও কাঠামো রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে গঠনবাদীদের মধ্যে চিন্তাধারার পার্থক্য ও মতভেদ প্রকট হয়ে ওঠে এবং এই সমালোচকদের কেউ কেউ এই মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে মেনে না-নিয়ে তার সীমাবদ্ধতাগুলিকে চিহ্নিত করেন। তাঁরা মনে করেন সাহিত্যকে কখনোই একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। এভাবেই ১৯৬৬ সাল নাগাদ গঠনবাদ থেকে থেকে জন্ম নেয় পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম (Post Structuralism) বা উত্তর গঠনবাদ। গঠনবাদী চিন্তাধারা থেকে উত্তর গঠনবাদী চিন্তাধারায় উত্তরণের সন্ধিক্ষণকে মহা সমারোহে উদযাপন করছে বার্থের 'দ্য ডেথ অব থি অথর'।

লেখকের মৃত্যু ও পাঠকের জন্ম

বার্থ তাঁর প্রবন্ধে বলেন যে, পাঠ্যবস্তুর (Text) কোনো নির্দিষ্ট অর্থ থাকে না। তাঁর এই স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার আকাশে নতুন সূর্যের উদয় ঘটায়। চিরাচরিত সমালোচকেরা পাঠ্যবস্তুর কেন্দ্রবিন্দুতে লেখকের একচ্ছত্র অধিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেন। তাঁদের মতে টেক্সটের সমস্ত অর্থের একমাত্র উৎস হলেন লেখক স্বয়ং। তাই তাঁদের টেক্সট-বিশ্লেষণ কখনোই লেখকের ব্যক্তিজীবনের প্রভাব মুক্ত হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বার্থ উল্লেখ করেন 'The image of literature to be found in ordinary culture is tyrannically centred on the author, his person, his life, his tastes, his passions ...' প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্যের নিজস্ব রসকে নষ্ট করে দেয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে বার্থ বলেছেন, এখনও অধিকাংশ সাহিত্য সমালোচক মনে করেন বোদলেয়ার-এর সাহিত্য আসলে তাঁর ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতারই প্রতিচ্ছবি — '... criticism still consists for the most part in saying that Baudelaire's work is the failure of Baudelaire the man ...' কিন্তু বার্থের কাছে সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ, সাহিত্যিক নন। কারণ তিনি মনে করেন — 'Writing is that neutral, composite, oblique space where our subject slips away, the negative where all identity is lost, starting with the very identity of the body writing'।

আস্তিকেরা বিশ্বাস করেন যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন ঈশ্বর এবং একমাত্র তিনিই সকল সৃষ্টির উৎস। ঠিক তেমনই চিরাচরিত সাহিত্য সমালোচকদের কাছে লেখক নামক অদৃশ্য ঐশ্বরিক শক্তিটি সর্বদা সাহিত্যের মধ্যে উপস্থিত এবং সাহিত্যের সমস্ত অর্থের উৎস হলেন একমাত্র তিনিই। তাঁদের কাছে লেখক ঈশ্বরতুল্য। ঈশ্বর যেমন ব্রহ্মাণ্ডের বিন্যাস ও স্থিরতাকে অক্ষুন্ন রাখেন তেমনই সাহিত্যের বিন্যাস ও স্থিরতা লেখকের উপর নির্ভরশীল। বার্থ মনে করেছেন, চিরাচরিত ধারার সাহিত্য সমালোচকদের কাছে তাঁর এই লেখক-নিরপেক্ষ টেক্সট-বিশ্লেষণ একটি ঈশ্বর-বিরোধী কাজ হিসাবেই চিহ্নিত হবে। কারণ এটি লেখক নামক ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁর সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী — 'In precisely this way literature (it would be better from now on to say *writing*), by refusing to assign a 'secret', an ultimate meaning, to

the text (and to the world as text), liberates what may be called an anti-theological activity, an activity that is truly revolutionary since to refuse to fix meaning is, in the end, to refuse God and his hypostases – reason, science, law'।

বার্থের মতে লেখকের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই পাঠকের জন্ম হয়। আসলে এখানে তিনি লেখকের বাস্তব মৃত্যুর কথা না-বলে আলংকারিক মৃত্যুর কথাই বলেছেন। লেখকের এই মৃত্যু হল, প্রতীকী মৃত্যু (symbolic death) বা রূপকীয় মৃত্যু (metaphorical death)। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বার্থ লেখকের সর্বময় কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে বলেন যে, লেখক যে সময় লিখতে শুরু করেন, ঠিক তখনই তাঁর ব্যক্তিসত্তা লোপ পায় এবং এইভাবে লেখক তাত্ত্বিক দিক থেকে নিজের মৃত্যুর পথে এগিয়ে যান – '...the author enters into his own death, writing begins'। এইভাবে সাহিত্যের মধ্যে লেখকের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি না-দিয়ে বার্থ প্রতীকীভাবে লেখকের মৃত্যু ঘটিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন – '... the birth of the reader must be at the cost of the death of the Author' অর্থাৎ বার্থ-এর মতে লেখকের মৃত্যু হল টেক্সটের মধ্যে লেখকের চূড়ান্ত আধিপত্যকে অস্বীকার করা। লেখকের প্রতীকী মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সাহিত্যের ভাষা সাহিত্যিকের চিন্তাভাবনার প্রভাব মুক্ত হয়। ভাষা খুঁজে পায় আপন স্বাধীনতা। আর ঠিক তখনই সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিকশিত করতে পারে। কারণ বার্থ-এর মতে — ' ...it is language which speaks, not the author ...'।

পাঠকের মুক্তি

লেখকের মৃত্যুর মতো পাঠকের জন্মও প্রতীকী ব্যাপার। টেক্সটের মধ্যে লেখকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বার্থ লেখকের সঙ্গে লেখার সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করেন। তাঁর মতে সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন করার পর স্রষ্টার মৃত্যু ঘটে। তিনি মনে করেন সাহিত্য সৃষ্টির পর লেখকের কাজ শেষ। তারপর সেই সাহিত্যের উপর লেখকের আর কোনো অধিকার থাকে না। এইভাবে তিনি লেখক সত্তার মৃত্যু ঘটিয়ে সাহিত্যের অর্থ নির্মাণের সমস্ত ক্ষমতা পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। পাঠক, সাহিত্য পাঠ করে তার রস আস্বাদন করবেন এবং তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা দিয়ে সাহিত্যকে বিচার ও বিশ্লেষণ করবেন। পাঠক, সাহিত্যবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কখনোই লেখকের চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। কারণ তিনি যখন সাহিত্য পাঠ করবেন, তখন সাহিত্যকে তিনি কোনো লেখকের অধীনস্ত সম্পত্তি না-ভেবে স্বশাসিত একটি উপাদান হিসাবে পাঠ করবেন। আর এভাবেই লেখকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জন্ম হবে পাঠকের। পাঠক যখন লেখকের প্রভাব মুক্ত হয়ে পাঠ করতে পারবেন, তখনই প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের আত্মার স্বর ধ্বনিত হবে। লেখকের নিয়ন্ত্রণ পাঠকের চিন্তাধারাকে শৃঙ্খলিত করে সাহিত্যকে আড়ষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে। পাঠক নামক পাখিটির পায়ে এতদিন 'লেখকের উদ্দেশ্য' (authorial intention) নামক যে বেড়িটি পরানো ছিল তা থেকে বার্থ, পাখিটিকে মুক্ত করেন। ফলত সাহিত্যের সীমাহীন আকাশে পাঠক সর্বত্র অবাধে বিচরণ করতে পারেন এবং নতুন আবিষ্কারের খেলায় মেতে ওঠেন। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ মনে এসে যায়, আমরা যখন দোকানে পোশাক কিনতে যাই, তখন জানতে চাই না পোশাকটি কোন্ দর্জি কোন্ পোশাক-রুচিকে (fashion sense) মাথায় রেখে বানিয়েছেন। তার ফলে পোশাকটি সম্পর্কে আমরা আমাদের নিজস্ব রুচি, পছন্দ ও অপছন্দ নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে পারি। পোশাকের ব্যাপারে আমাদের উপর যদি পোশাক নির্মাতার অভিরুচি আগে থেকেই

চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা কখনোই স্বাধীনভাবে পোশাকটি নিয়ে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করতে পারব না এবং সেটা পরিধান করে স্বাচ্ছন্দ্য পাব না। ঠিক তেমনই সাহিত্য পাঠের সময় পাঠকের উপর যদি লেখকের মতামত ও চিন্তাধারাকে আগেভাগে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পাঠক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর স্বাধীন মতামত গঠন করতে ব্যর্থ হবেন। বার্থ, সাহিত্যের যৌবরাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠকের অভিষেক ঘটিয়েছেন। তাঁর মতে লেখক নয়, সাহিত্যের অর্থ নির্ধারণের একমাত্র অধিকারী হলেন পাঠক। পাঠকের অভিব্যক্তিই টেক্সটের চূড়ান্ত অর্থ নির্ধারণ ও নিশ্চিত করবে। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বার্থের এই অভিমত পরবর্তীকালে 'রিডার রেসপন্স থিয়োরি' (Reader Response Theory) নামক একটি নতুন সাহিত্যতত্ত্বের জন্ম দেয়, যেখানে পাঠকই সর্বেসর্বা।

আলোচ্য প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে বার্থ সাহিত্যের দরবারি-সিংহাসনটিতে লেখকের পরিবর্তে পাঠককে বসিয়ে তাঁর হাতে সার্বভৌম ক্ষমতার রাজদণ্ড ধরিয়ে দিয়েছেন। বার্থের আগে কখনও কোনো সমালোচক পাঠককে এতটা গুরুত্ব দেননি। লেখককে কেন্দ্র করে প্রান্তে থাকা পাঠকদের নিয়ে গড়ে ওঠা সাহিত্য-সাম্রাজ্যে তিনিই প্রথম, দিনবদলের গান শোনান। এদিক থেকে তিনি একজন বিপ্লবী, যিনি চিরাচরিত সমালোচনার ধারা অস্বীকার করে প্রলেতারিয়েত পাঠকের জয়পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন সাহিত্যের আকাশমণ্ডলে। তাঁর হাত ধরে পাঠক আজ সাহিত্য দুনিয়ার কেন্দ্রে স্বমহিমায় বিরাজমান। বস্তুতপক্ষে রঁলা বার্থ-এর 'দ্য ডেথ অব দি অথর' মূক পাঠকের মুখে ভাষা ফুটিয়ে সাহিত্য সমালোচনা বিশ্বে এক অভিনব আঙ্গিক নির্মাণ করেছে। বার্থ-এর মতে সাহিত্য থেকে সাহিত্যিকের বিচ্ছিন্নতা আধুনিক সাহিত্যকে একটি নতুন দিশা দিয়েছে — 'The removal of the Author ... is not merely a historical fact or an act of writing; it utterly transforms the modern text...'।

লেখকের মৃত্যু ও পাঠকের জন্ম নিয়ে যে ধাঁধা তৈরি হয়েছিল, অবশেষে 'দ্য ডেথ অব দি অথর'-এর বিশ্লেষণ সেই ধাঁধার অবসান ঘটাল। বার্থ-এর কালজয়ী এই প্রবন্ধটি সর্বকালের সমস্ত সাহিত্যপ্রেমী মানুষের কাছে বিশেষ সমাদরের। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একুশ শতকে বিজ্ঞানের অকৃপণ দান মানুষকে প্রযুক্তিবিদ্যার শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। তাই আজকের তরুণ প্রজন্মের সিংহভাগ বই থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে বিনোদন ও অবসর যাপনের জন্য মোবাইল ও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াকে বেছে নিয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতেও যে সকল তরুণ, সাহিত্যকে ভালোবেসে বইকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাইছে, তারা বই-বিমুখ মানুষদের দ্বারা নানাভাবে সমালোচিত হচ্ছে। বার্থ-এর প্রবন্ধটি এই সমস্ত সংকটাপন্ন পাঠককে সাহিত্য পাঠের নতুন উদ্যম যোগাবে। সেই সঙ্গে যারা আজ সাহিত্য-বিমুখ, বার্থ-এর এই প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদেরও কেউ কেউ হয়ত নিমগ্ন পাঠক হয়ে উঠতে চাইবে — এমনটা আশা করা যেতেই পারে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Barry, peter. Beginning Theory. Vinod Vasishtha, 2010.
২. Barthes, Roland. ' The Death of the Author '. Translated and edited by S. Heath.
৩. Chandran, Joseph and Samy, K.S. Antony. Classical to Contemporary Literary Theory. Atlantic, 2010.
৪. Habib, M.A.R. Literary Critism from Plato to the Present. Wiley-Blackwell, 2011.
৫. Nayar, k. Pramod. Contemporary Literary and Cultural Theory. Pearson, 2009.
৬. Tyson, Lois. Critical Theory Today. Routledge, 2006.

গড়িয়ে চলে গেলো যে চাকা, সে কি আর ফিরে আসে, আসে, আসে?!?

প্রবীর মণ্ডল

বিনয় মজুমদারের তখন ছাত্রজীবন। ভার্সিটি লাইফ। কবিতা কবিতা করে তুমুল পাগলামি। তাঁকে ঘিরে শত শত বন্ধুদের তুমুল উৎসাহ আর হই-হুল্লোড়। কখনও কফিহাউসের এককোণে নিশ্চিন্তে ফিরে এসো চাকাকে কবিতা শোনানো। যাকে বলে গোপনে পাওয়া। সে এক চূড়ান্ত পাগলামির উন্মাদনা।

বিনয় সম্পর্কে শক্তি লিখেছেন, তাঁর কবিত্ব প্রতিভা এমনই যে তিনি চাইলেই এমনকি গু-গোবর নিয়েও কবিতা লিখতে পারেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস, মেধাবী ও মহাশক্তিধর এই কবিই থাকলেন অনেকটা আড়ালে। অদ্ভুত আঁধারে। তাঁর বন্ধুদের মতো বহুগামী হলেন না। এক নারীতেই পাগল হলেন। এমনকি বিয়েও করলেন না। সেই যে কবিতার গলায় মালা পরালেন আর তাকেই নিবেদন করলেন সমগ্র জীবন। কাছে পিঠে কেউ থাকল না নিঃসঙ্গতা ছাড়া।

বিনয় মজুমদার যখন শিমুলপুরে অন্ধঘরে একা একা কবিতার সঙ্গে যাপন করছেন, তখন একবার সম্ভবত আক্ষেপেই লিখলেন — এক সময় ভাবতাম আমার কতো বন্ধু। এখন দেখি একশো নয়, এক বা দুটো বন্ধুও নেই।

আমারও আজকাল কেন জানি মনে হয়, বন্ধু বলে সত্যিই কিছু হয় তো!! এখন এই আটত্রিশ প্লাস জীবনে আমারও একটি বা দুটি বন্ধু আছে কিনা ভাবতে বসি...

কবি বিনয় মজুমদার: টুকরো কথার কোলাজ

২০০৬ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ, তখন জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলায়। বইমেলার মাঠে একজন আরও দু-তিনজনকে বলছেন, বিনয় মজুমদার আর নেই। শুনে চমকে উঠলাম! এবং নিশ্চিত হওয়ার জন্যে যেচে অচেনা মানুষটির কাছে জানতে চাইলাম, আপনি কি কবি বিনয় মজুমদারের কথা বলছেন? তিনি বললেন, বিনয় মজুমদার একজনই হন – তিনি কবি বিনয় মজুমদার। উনি আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু এর পরেও আমার যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। কলকাতায় দাদাকে ফোন করে নিশ্চিত হলাম যে, কবি বিনয় মজুমদার সত্যিই আর বেঁচে নেই। যে মানুষটি জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলার মাঠে আমাকে এই খবরটি জানিয়েছিলেন – অবশ্য ঠিক জানিয়েছিলেন একথা বলব না, তাঁর মুখ হতে উচ্চারিত শব্দগুলি শুনে ফেলেছিলাম। শুধু এই খবরটি তাঁর মুখ থেকে শুনে ফেলেছিলোম এই অপরাধে তিনি যেন আমার চিরশত্রু হয়ে উঠলেন। কেন তিনি এরকম একটা দুর্ঘটনার খবর আমাকে শোনালেন? সুতরাং তেমন তেমন মানুষের মৃত্যুর খবর শোনানো অপরাধের বই-কি।

মনে আছে, সেবার জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলার মাঠে অভিযান পাবলিশার্সের স্টল থেকে বারাসাতের কবি শৌনক বর্মণ সম্পাদিত *প্রচ্ছায়া* পত্রিকার বিনয় মজুমদার সংখ্যা ৩৭ কপি বিক্রি হয়। সেই প্রথম ওই বয়সে কবি বিনয় মজুমদারের প্রতি আমার দুর্বলতা আরও গভীর হয়। ঠিক এভাবেই কখনও কখনও মৃত্যুর পর কোনো কোনো মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসা আগের থেকে আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

কলকাতায় ফিরে আকাশবাণী যুববাণী সেকশনে গেছি, একটি অনুষ্ঠানে ভয়েস রেকর্ডিং ছিল। আকাশবাণীর দোতলার বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, এমন সময় সাদা চুলের ফরসা, গোলগাল মুখের সুন্দর দেখতে একজন মানুষ হন্তদন্ত হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'উজ্জ্বল মাছ', তারপর কী যেন – 'দৃশ্যত সুনীল' ঠিক মনে পড়ছে না, তুমি কি জানো?

বললাম, 'একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে পুনরায় ডুবে গেল।'

এই শব্দগুলি শুনে মানুষটি হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন।

পরে জানলাম, মানুষটি স্বপ্নময় চক্রবর্তী। বুঝলাম, আকাশবাণীতে কবি বিনয় মজুমদারকে নিয়ে লাইফ প্রোগ্রামে একটা কিছু আলোচনা হচ্ছে।

একটা ছোট্ট দেড় পাতার *কাব্য ভাবনা* প্রবন্ধে ২০০০ সালে কবি বিনয় মজুমদার তাঁর কবিতা-পঙ্‌ক্তির উল্লিখিত এই শব্দগুলি উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'উৎপল শোনো – মনে মনে বললেই কিংবা বই খুলে পড়লেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে আমি যেখানেই থাকি, আমাকে দেখবেই।' এখন বুঝতে পারি বিনয় মজুমদার কী মারাত্মক থিয়োরি আবিষ্কার করেছেন। কত কত লেখক মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকেন অসম্ভব স্মৃতি হয়ে। পড়তে গিয়ে তাঁকে দেখতে পাই তাঁর লেখার ভিতর। কবি বিনয় মজুমদারের সঙ্গে তাঁর কবিতা পড়ার ছলে আমার অনেক কথা হয়, দেখা হয়। পাঠক, তা বলে সে সবের মধ্যে আপনি আবার প্ল্যানচেটের স্বপ্ন দেখবেন না। যখনই তাঁর সম্পর্কে কিছু পড়ি, তখনই স্বচক্ষে আমি যেন তাঁর সমগ্র অবয়ব দেখতে পাই। লক্ষ করতে পারি তাঁর হেঁটে চলে বেড়ানো, কবিতা পড়া – অন্ধকার ঘরে বসে কবিতা লেখা – এমনকি কীভাবে তিনি বিড়ি খেতেন, তাও।

পাঠক, আপনারা জানেন, উল্লিখিত উৎপল হলেন *কবিতীর্থ* পত্রিকার সম্পাদক উৎপল ভট্টাচার্য, যিনি বিনয় মজুমদারের অনেকগুলো বইয়ের প্রকাশক। আবার সম্প্রতি বিনয় মজুমদার সংখ্যার পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেছেন তিনি।

কিছুদিন আগে অবনীন্দ্র সভাঘরে কবি বিনয় মজুমদার স্মরণ কমিটি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদিন কবি বিনয় মজুমদার স্মৃতি সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় কবি বিনয় মজুমদারের বিখ্যাত প্রবাসী বন্ধু, কবি ও প্রাবন্ধিক জ্যোতির্ময় দত্তের হাতে। কিন্তু এদিনের একটি ন্যাকামো ছিল চোখে লাগার মতো, কানে বাজার মতো। অনুষ্ঠান হচ্ছে কবি বিনয় মজুমদারকে নিয়ে, বিশেষত স্মরণানুষ্ঠান; আর সেই অনুষ্ঠানে একটি মেয়ে আর ছেলে অত্যন্ত সাজুগুজু করে, যৌথভাবে ঢং করে করে সঞ্চালনা করছেন, যা বিনয় অনুরাগীদের একেবারেই মেনে নেওয়া বা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। তারপর তাঁর কবিতা নিয়ে ছেলে-মেয়েতে মিলে গাওয়া হচ্ছে কোরাস সংগীত।

আমরা অনেক সময় ভুলে যাই গানের মতো কবি ও কবিতারও স্বতন্ত্র ঘরানা থাকে – কবি বিনয় মজুমদার এবং বিনয় মজুমদারের কবিতারও আছে সেই স্বতন্ত্র ডিক্‌শন। এমনকি, মানুষটাও তো ... হ্যাঁ, তাঁর সকল বন্ধুদের থেকেও তিনি তো একেবারেই আলাদা ছিলেন ব্যক্তিজীবন বা কবিজীবনে। আর আজ তাঁকে নিয়ে, তাঁর কবিতা নিয়ে ... প্রেক্ষাগৃহে বসে অস্থির হয়ে ভাবছিলাম বিনয় মজুমদার বেঁচে থাকলে এই ধরনের ন্যাকামো কীভাবে মেনে নিতেন। এদিনের সম্মাননা প্রাপক শ্রী জ্যোতির্ময় দত্ত দেখি অত্যন্ত বিরক্তির সুরে, একটু রাগত স্বরে প্রতিবাদ জানালেন সমস্ত হাস্যকর ক্যাবলামোর বিরুদ্ধে। এরপর আমরা বিনয়-অনুরাগী বন্ধুরা কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। এইসব

ফালতুমি দেখে সম্ভবত দময়ন্তী বসু মঞ্চে বসে মুচকি মুচকি হাসছিলেন।

জীবনানন্দ সভাঘরে একবার আরও একটি অনুষ্ঠানে অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক ড. অনিমেষকান্তি পাল তীব্র জেলাসিতে নাকি ব্যক্তিগত আক্রোশে জানি না, কবি বিনয় মজুমদারকে (যদিও এই অনুষ্ঠানে বিনয় মজুমদার উপস্থিত ছিলেন না) ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, একসময় ইন্টেলেকচুয়ালদের পাগল বলা হত, এখন দেখি পাগলদেরও ইন্টেলেকচুয়াল ভাবা হয়। ভাবুন। বিস্ময় আর কাকে বলে।

বাংলা কবিতাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে গিয়ে এই বাংলায় আর কেউ কখনও পাগল হয়েছেন বলে শুনিনি। কিছুটা ফরাসি দুই কবি র‍্যাঁবো আর ভের্লেন-এর জীবনযাপন বিনয় মজুমদারের। সব আছে, তবু কিছু নেই। স্যরি, ভুল বলা হল – জীবৎকালে তাঁর জন্য ছিল অসম্ভব গ্লানি আর অপমান। মাত্র একজন নারীকে পাগলের মতো ভালোবাসতে গিয়ে সমগ্র জীবন প্রায় পাগল হয়ে কাটিয়ে দিলেন। ভাবুন, একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার নয়, আট-আটবার, পাগলা গারদে – অসম্ভব যন্ত্রণা নিয়ে ...

অনিমেষবাবু জেলাসির মহিমায় যেটা ভুল করলেন, ইন্টেলেকচুয়াল বিনয় মজুমদারকে না-পড়ে, না-খুঁজে পাগল বিনয়ের খ্যাতিকে মেনে নিতে পারলেন না। জানি, এই লেখাটি পড়তে গিয়ে অনেক পাঠকই প্রশ্ন তুলবেন, কে এই অনিমেষকান্তি ? কারণ আর কিছু নয় – কারণ বুদ্ধিমান, অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক, না-পাগল এই মানুষটিকে আজ আর কেউ চেনেন না ? অথচ মানুষ চেনেন পাগল কবি বিনয় মজুমদারকে। আর অঘ্রাণের অনুভূতি মালায় জড়িয়ে নেন নিজেকে। ফিরে ফিরে পড়েন *ফিরে এসো চাকা*। এই সেই কাব্যগ্রন্থ, শুনেছি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সারাজীবন এই একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থই নাকি আলোচনা করেছিলেন।

পৌষপরব - বড়পরব

অরূপ শান্তিকারী

কথায় বলে – 'কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ।' আর এই পৌষমাস মানেই পৌষপরব। পশ্চিম সীমান্তসহ রাঢ় অঞ্চলে সর্বাধিক জনপ্রিয় লোকপরব পৌষপরব। পৌষমাসে কৃষক পরিবারে গোলা ভরা ধান। তাই আর্থিক অবস্থা খানিকটা স্বচ্ছল থাকে। সারা পৌষমাস পরবের মাস। অঘ্রান সংক্রান্তিতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়াসহ সমগ্র মানভূমের মেয়েরা টুসু পাতে। একটি মাটির নতুন সরাতে চালগুঁড়ি, সিঁদুর দিয়ে সাজিয়ে ধান, দূর্বাঘাস ও আতপচাল সহযোগে কুলুঙ্গিতে টুসুকে রাখা হয়। সারা মাস ধরে গানের মধ্য দিয়ে অতি আদরের টুসুধনকে পূজা করে। টুসুগানে মানুষের জীবনযাত্রার দুঃখ-দুর্দশা ও আনন্দের কথা প্রতিফলিত হয়। গানগুলি তাৎক্ষণিক। টুসু যেন বাড়ির আদরের মেয়ে। মকরের আগের রাত্রি টুসু-জাগরণ। সারারাত্রি মেয়েরা টুসুগানে মাতোয়ারা এবং ভোরে মকর সংক্রান্তিতে টুসুকে বিসর্জন দেওয়া হয়। লাল-নীল কাপড়ের তৈরি চৌডোলে টুসুকে রেখে গানে গানে টুসুকে বিদায় দেয়। বিসর্জন দিতে মন চায় না। কাঁসাই-শিলাই-দামোদর নদীতে বিসর্জনের বিরাট শোভাযাত্রা দেখতে পাওয়া যায়। এই সময় বাড়ির মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এসে টুসুপূজায় অংশ নেয়।

টুসু পরব ও মকর পরবে প্রান্তিক মানুষগুলির উৎসবের আনন্দ ধরে না। প্রায় প্রত্যেকে নতুন জামাকাপড় কেনে। বাড়িতে আছে ধান, তাই মকর পরবে সীমাহীন আনন্দ। 'ধানের গরব মকর পরব'— এই প্রবাদই তা প্রমাণ করে। পৌষমাসের শেষ তিনদিন চাঁউড়ি- বাঁউড়ি ও মকর এবং মাঘমাসের প্রথম দিনগুলি এখ্যান-ছেঁছান-ঘেঁঘান সবমিলিয়ে পৌষপরব। চাঁউড়ি দিনে দুটি ছোটো হাঁড়িতে শুদ্ধ কাপড়ে গ্রামের মহিলারা জল আনে। ওই জল দিয়ে ঢেঁকিতে কুটে চাল গুঁড়ো করে পিঠে বানায়। চাঁছি ও নানারকম সব্জি, ডালের পুর দিয়ে পিঠে, বাঁকা পিঠা, গড়গড়্যা পিঠা ইত্যাদি। এছাড়া ছিলকা ও অ্যাসক্যা পিঠা। এই পিঠা পরবে মহিলাদের শৈল্পিকভাবের প্রকাশ পাওয়া যায়। তাই মানভূমের প্রচলিত প্রবাদে আছে — 'মেয়্যার গরব পিঠা পরব।' পিঠা পরব ছাড়াও হলুদ মাখিয়ে হলদে মুড়ি বা পিয়লো মুড়ি ভাজা হয়। তিল দিয়ে তিলনাড়ু বানানো হয়। পৌষ পরব যেন খাওযার পরব। বাঁউড়ি দিনেও পিঠা বানানো হয় এবং লক্ষ্মীকে বাড়িতে ধরে রাখার জন্য ছোটো ধানের গোলা বাঁধানো হয়। এটিকে বাঁউড়িবাঁধা বলে। মকর দিনে স্নান সেরে এসে গুরুজনদের নিকট ছোটোরা তিলামাসা খাটে। গুরুজনেরা তিলনাড়ু ও চাঁছি দিয়ে তিনবার বলে, তিলামাসা খাটবে? তখন ছোটোরা গুরুজনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তিনবার উত্তর দেয়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। পৌষমাসে সাঁওতালদের সহরা বা বাঁধনা পরব হয়। যদিও মূল সহরা পরব হয় কার্তিক মাসে। কিন্তু চাষের কাজে ব্যস্ততার কারণে বেশিরভাগ গ্রামে পরবটিকে পৌষমাসে স্থানান্তরিত করা হয়। সহরায় শব্দ থেকে সহরা এসেছে। সহরা মানে প্রশংসা। বাড়িগুলি মাটি দিয়ে লেপন করে এবং দেওয়ালে বিভিন্ন রকমের নকশা আঁকে। বুধবার দিন পরবটি শুরু। সেদিন স্নান ও কাপড়কাচা হয়। বৃহস্পতিবার প্রত্যেকের বাড়িতে গুরুহড়দের পূজা। গোয়ালপূজা এবং হালের যন্ত্রাংশ ধুয়ে পরিস্কার করে চালের গুঁড়ি ছিটিয়ে দেওয়া হয়। গরুকে তেল, সিঁদুর মাখিয়ে, আতপ চাল ও প্রদীপ দেখিয়ে বন্দনা করা হয়। একে বলে 'গরু বান্দনা'। এই সময় যে গান গাওয়া হয় সেইগুলিকে বলে অহিরা গান। এরপর হয় গরুখুঁটা। গরু বা কাঁড়াকে শক্ত খুঁটিতে বাঁধে এবং বাদ্যযন্ত্রসহ গানের মধ্য দিয়ে গরুটিকে ভিড়কানো

হয়। গরু বা কাঁড়াটি ঢোল মাদলের শব্দে লাফাতে থাকে তখনই যুবক-যুবতীর নাচ গান শুরু হয়। পরদিন বুড়ি বান্দনা। ওইদিন সাঁওতাল বুড়িরা হাঁড়িয়া খেয়ে নৃত্য করে। শেষদিনে জালে অর্থাৎ অবশিষ্ট অংশ।

মাঘমাসের প্রথম দিন আখান বা এখ্যান। অক্ষ-অয়ন শব্দ থেকে আখান। মানভূমে বলা হয় খ্যান। এইদিন থেকে সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হয় আবার এখ্যান দিনে কৃষিবর্ষ শুরু। কৃষক নিয়োগ, ভালো কাজের শুরু এখ্যান দিনেই করা হয়। তাই এখ্যান যাত্রা বা যাত্রা অতি পবিত্র দিন। প্রত্যেক গ্রামের গ্রামদেবী বা লৌকিকদেবীর পূজা করা হয়। হাঁস, মুরগি ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। তাই এখ্যান কিছুটা হলেও মাংস খাওয়ার পরব। এখ্যান দিনের পরদিন ছেঁছানো। কোনোরকম ছেঁছান যেমন ঢেঁকিপাড়া বা ছেঁছানো চলবে না। ছেঁছানের পরদিন ঘেঁঘান। যদিও ঘেঁঘানের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। পরবর্তী দিনগুলিতে অতিথি বাড়ি থেকে না যেতে দেওয়ার জন্য বলা হয় ।

এখ্যান-ছেঁছান-ঘেঁঘান
রাঁইরুঁই-সাঁইসুঁই-ছেল্যাকাছড়া
টুকিঝাড়া-তার বিহানে আসবি তুঁই।

মানভূমে লোকপ্রবাদে এই ছড়াটির গুরুত্ব অসীম। পৌষপরবে যেমন লোকাচার আছে তেমনি আছে কিছু প্রথা, আনন্দোৎসব। মানভূমে মোরগ লড়াই প্রায় সারা বৎসর হয়ে থাকে। কিন্তু মকর দিনের মোরগ লড়াইয়ের চেহারাটাই আলাদা। সাঁওতাল ও বাউড়ি-বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষ ওইদিন সকালে মোরগ লড়াইয়ের জন্য বেরিয়ে পড়ে। সারাদিন মোরগ লড়াই চলে এবং তার সাথে হাঁড়িয়া খেয়ে আনন্দে কাটে, সাথে চলে ঝুমুর গান। মোরগ লড়াইয়ের আনন্দে বাড়িতে বসে যায় ঝুমুর গানের পসরা। এছাড়াও মকর দিনে কিশোরদের চলে ডাং-গুলি খেলা। মকর দিনে সকালে কিশোররা ডাং-গুলি নিয়ে মাঠে যায়। বর্তমানে এই খেলাটি আর দেখতে পাওয়া যায় না বললে চলে।

পৌষপরবকে কেন্দ্র করে পুরুল্যা-বাঁকুড়া জেলায় অনেকগুলি মেলা হয়ে থাকে। আদিবাসি গ্রামগুলিতে ৩, ৪ বা ৫ মাঘ ধানসিং-মানসিং মেলা, এখ্যান দিনে বেড়ো গ্রামে সাত দিনের খেলাই চণ্ডীর মেলা, কালিদহ (কাশীপুর) গ্রামে পৌষ সংক্রান্তির মেলা, পুরুলিয়ার নিকট জামবাদ্যের মেলা ও নপাড়া-বড়গ্রামের শিলাবতী নদীর তীরে মকর সংক্রান্তির মেলা। বাঁকুড়া জেলার পোড়কুল মেলা ও তুলিনের মকর মেলায় প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। পৌষপরবের মধ্যে দিয়েই টুসু পরব, পিঠা পরব, মকর পরব, এখ্যান পরবগুলিতে মানভূম সংস্কৃতির চিত্র ভেসে আসে।

শব্দার্থ :

কাঁড়া – মহিষ, মেয়্যা – মহিলা, এখ্যান – ১লা মাঘ বা আখান, ভিড়কানো – কৃত্রিম ভয় দেখানো, উফাল – উপরে লাফানো, হাঁড়িয়া – পান্তা থেকে প্রস্তুত বিশেষ ধরনের মদ, বিটি – মেয়ে।

তথ্যসূত্র :

বাংলার নারী সংস্কৃতি, মিহির চৌধুরী কামিল্যা।
পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি, দিলীপ কুমার গোস্বামী।
লোকায়ত মানভূম, শ্রী নবকুমার সরকার।
পুরুলিয়া সংহতি, শারদ সংখ্যা ১৪১৭।
বাংলার লোকসংস্কৃতি, আশুতোষ ভট্টাচার্য।

তালডোঙা

সুদীপ ঘোষাল

ভাদু জেলে, মাছ ধরে। তার আগে তার দাদুও মাছ ধরে সংসার চালাতেন। বাড়ির পাশেই কাঁদর। অনেকে বলেন ঈশানী নদী। ভাদু অত কিছু জানে না। কাঁদরে চান, কাঁদরে টান তার। একটা তালগাছের গোড়া ফাঁপা করে ডোঙা বানানো হয়েছে কাঁদর এপার-ওপার করার জন্য। ডোঙার তলাটা মাঝেমাঝে রঙ করা হয়। ডোঙায় চেপে কাঁদরে জাল ফেলা শিখেছে তার দাদুর কাছে ভাদু। তারপর মাছ ধরে বাঁশের কঞ্চির তৈরি ঝাঁপিতে ভরে মাছ বিক্রি করত গ্রামে গ্রামে। ছেলে ভোলাকে গাঁয়ের স্কুলে ভরতি করেছিল সাতবছর বয়সে। এখন সে হাইস্কুলে পড়ে। কিন্তু মাস্টারমশাইরা বলেন ভাদুকে, তোর ছেলেকে বাড়িতে পড়তে বলিস। খুব ফাঁকিবাজ। এবার নম্বর খুব কম পেয়েছে।

ভাদু, রাতে ছেলের কাছে বসতে পারে না। সন্ধ্যা হলেই সে চলে যায় হরিনামের আখড়ায়। সেখানে হরিনাম হয়। ভাদু হারমোনিয়াম বাজায়। বড় সুন্দর তার হাত, সবাই বলে। এদিকে ছেলে ভোলা বই গুটিয়ে অন্ধকারে বসে থাকে কাঁদরের ধারে। পড়াশোনা তার ভালো লাগে না। কাঁদরের ধারে অনিলের সঙ্গে বসে বাঁশি বাজায়। অনিল বলে, তোর বাবা শুনলে মারবে ভোলা, সাবধানে থাকিস। ভোলা বলে, এই সবুজ আমাকে বড় টানে। এই জল আমাকে শান্তি দেয়। চান করার সময় এক ডুবে সে কাঁদর পেরিয়ে যায়। অনিল, ভোলার খুব ভালো বন্ধু। সে সবসময় ভোলার সঙ্গে থাকে, থাকতে ভালবাসে।

ভোলা, মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করল। ভাদু বলল, আর স্কুলে যেয়ে লাভ নাই রে ভোলা। রোজগারের ধান্দা কর। ভোলা তাই চাইছিল। সে বলল, বাবা আমি জাল ফেলা শিখব। ভাদু বলল, তা শেখ। কিন্তু তুই তো ভালোই জাল ফেলিস। আমি চাইছিলাম রামের সঙ্গে তু কেরালা যা। সোনার দোকানে কাজ শিখে লেগা। তারপর এখানে এসে একটা দোকান খুলবি। কত নাম হবে তখন তোর দেখবি। ভোলা বলল, না বাবা আমি কেরালা যাব না। ভাদু বলল, আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। তু আর অনিল কাল কেরালা চলে যা। মেলা পয়সা হবে, নামডাক হবে। তা না হলে জলে পচে মরবি।

বাবার ভয়ে তারা কেরালায় চলে গেল। দোকানে কাজ করে কাজ শেখে। তাদের দোকান বাজার, কেনাকাটা সব কাজ করতে হয় ভোলাকে। বাঁশি বাজাতে দেয় না। তার মনে পড়ে কাঁদরের ধারে গেলেই মনটা ঘাসের গন্ধে ভুরভুর করে উঠত। একটা ঠাণ্ডাবাতাস গায়ে কাঁটা তুলে দিত। বাঁশির সুরে কাঁদরের জল নেচে উঠত। বাবা-মার কথা মনে পড়ত। কিছু ভালো লাগত না। তার বন্ধু অনিল কাজ করে অনেক দূরে আর একটা দোকানে। সন্ধ্যা হলে দুজনের কথা হত। অনিল বলত, ভালো করে থাক। অনেক পয়সা নিয়ে বাড়ি যাব। কত খাতির হবে, দেখবি। অনিলের বাবা-মা নেই। সে ছোটো থেকে মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছে। তাই তার পিছুটান কম। সে পরিস্থিতি বুঝে কাজ করে। কিন্তু ভোলার কিছু ভালো লাগে না। প্রায় দুমাস পরে সে জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হল। মালিক বেগতিক বুঝে অনিলকে সঙ্গে করে ভোলাকে গাঁয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

বাড়িতে এসে ভোলা মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল। অনিল মামার বাড়ি গেল একটা বড় ব্যাগ নিয়ে। ভোলা কিছুই আনতে পারেনি। সে রোগে ভুগে হাড় জিরজিরে হয়ে গেছে।

মা তার বাবার ওপর রেগে গিয়ে বললেন, আবার যদি তুমি ওকে কেরালা পাঠাও তো আমার দিব্যি রইল। ভাদু আর ভোলাকে কেরালা যেতে বলেনি। শুধু বলেছিল, এখানে ও খাবে কী? আমি তো আর বেশিদিন বাঁচব না। তার মা বলেছিল, আমাদের একমুঠো জুটলে, ওরও জুটবে।

তারপর অনিল আবার কেরালা চলে গেল। ভোলা দুমাস বিছানায় পড়ে রইল। মায়ের সেবাযত্নে সে সুস্থ হয়ে উঠল। বছরের পর বছর কেটে গেল। ভাদুজেলে মরে গেল। তার হরিনামের দল তাকে উদ্ধারণপুর নিয়ে গেল ট্রাক্টরে চাপিয়ে। ভোলা সেই হরিনামের দলে ভালো বাঁশি বাজিয়েছিল। সবাই বলল, সন্দেবেলায় পেত্যেকদিন হরিনামের আসরে যাবি। বাঁশি বাজাবি।

আজ অনিল এসেছে পাঁচবছর পরে। গ্রামের মোহিনী ঠাকরুণ বলল, মামার একটু জায়গা নিয়ে গ্রামে সোনারুপোর দোকান কর। আমরা তোর খদ্দের হব। অনিল এইরকম কিছু একটা করার কথা ভাবছিল। মামাকে বলে একটা ঘর করল রাস্তার ধারে। তারপর অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে দোকানের শুভ উদ্বোধন হল। খুব ধুমধাম করে দোকান শুরু হল।

এদিকে ভোলা কাঁদরে জাল ফেলে মাছ ধরছে ডোঙায় চেপে। পাশ দিয়ে কাঠগোলার বড়বাবু যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, ও জেলে ভাই মাছ পেলে? ভোলা মাথাটা উঁচু করে বলল, পেয়েছি বাবু একটা কাতলা। তা কেজিখানেক হবে। বড়বাবু একটা দুশোটাকার নোট বার করে মাছটা নিলেন। তারপর চলে গেলেন। ভোলা টাকাটা কোঁচরে গুঁজে বাঁশি বের করে বাজাতে শুরু করল। আকাশ ভরে উঠল চিরকালের সুরে।

ঘুম

শ্যামল সরকার

বছরের প্রথম দিন বলে কথা। একটু জমিয়ে ডিনারের পরিকল্পনা করল নীল। একটি হাঁসের ডিম কিনে এনেছে পাক্কা দশ টাকায়। ওর একার সংসারে সেইই প্রথম ডিমের প্রবেশ। ফুটন্ত সরষের তেলে পুরোটা ভেঙে দিল। ছড়িয়ে গেল তরল প্রোটোপ্লাজম কড়া জুড়ে। পুট পুট করে ফুটছে। সাথে একটি সুন্দর সুঘ্রাণ। ঘন হয়ে গেল পুরোটা মুহূর্তে। ধবধবে সাদার বুকে উদীয়মান সূর্যের মতো মাঝে লালাভ হলুদ কুসুম। নুন আর কাঁচা লংকা ছড়িয়ে উলটে-পালটে নীল নামিয়ে নিল মহার্ঘ খাদ্যবস্তুটি। নীলের জীবনে প্রথম অমন সুখাদ্য প্রস্তুতি।

লণ্ঠনের মৃদু আলোয় খেতে বসেছে নীল। গরম গরম একথালা ভাত আর ওমলেট। মনটায় খুশির প্লাবন। কিন্তু তখনই মনে ভেসে উঠল পরদিনের ভাতের থালা। একথালা ভাত আর একদলা আলুসেদ্ধ। ফ্যাটফ্যাটে সাদা। বর্ণহীন, নির্জীব, অখাদ্য। পুরো ওমলেটটা আর খাওয়া হল না নীলের। জিভকে প্রায় পিছমোড়া করে বেঁধে ওই অমৃতখাদ্যের অর্ধেক তুলে রাখল পরদিনের জন্য।

রাতে বেশ ঘুম হল নীলের। ডিমসুখ সুখনিদ্রা। জাগতে দেরি হল খানিকটা। ততক্ষণে ওর বাঁশের ঘরের বেড়ার ফাঁকফোঁকর দিয়ে উঁকি দিতে শুরু করেছে রৌদ্রভাসা দিন। তার চোখ গেল মাটির মেঝেতে। বাসনকোশন এলোমেলো। ঘরময় ওমলেটের টুকরো আর ছুঁচোর গায়ের বোঁটকা দুর্গন্ধ। চোখ বুজে পাশ ফিরল নীল। নিজের ঘুমন্ত ভাগ্যের সাথে জড়াজড়ি করে আবার ডুবে গেল সে, নতুন ঘুমে।

ভ্রম সংশোধন

সুমন্ত কুন্ডু

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভবেশবাবু। বেশ নিশ্চিন্তেই হেলেদুলে বাড়ি ফিরছিলেন। আচমকাই মনের ভেতর একটা অস্বস্তি কামড় দিয়ে উঠল। কী একটা ভুল করেছেন তিনি। ভবেশবাবু রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। কী ভুল হল, মনে পড়ছে না কিছুতেই।

সবকিছু তো ঠিকঠাকই আছে। জীবনের কোনো কিছুতেই বিশেষ ভুল হয়নি এতদিন অব্দি। প্রয়োজন মতো পড়াশোনা, ভালো টাকার চাকরি, মনোমত বউ, বাড়ি-গাড়ি-সংসার-সন্তান সবেতেই তিনি ঠিকঠাক। এইমাত্র তালিকা মিলিয়ে যে বাজার করলেন তাতেও ভুল হওয়ার কথা নয়। তবু মনের ভেতর কী একটা কাঁটা যেন খচখচ করতেই থাকল।

জীবনের অনেকটা রাস্তাই বেশ হেলেদুলে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিয়েছেন। পাশে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া অনেক মানুষকে দেখেছেন। তাদের টেনে তুলতে গিয়ে নিজের সময় সেভাবে নষ্ট করেননি কখনোই। তাতে লাভই হয়েছে, নিজের পথে কখনও হোঁচট খেতে হয়নি। যেভাবে পৃথিবীকে শুষে মানুষ বেঁচে থাকে ঠিক সেভাবেই ভবেশবাবুও আছেন দিব্যি সুখে।

বাজার থেকে ফেরার পথে তবু মনটা এমন অস্থির লাগছে কেন? কিছু একটা বিরাট ভুল পিছনে ফেলে এসেছেন, ওটা শুধরে নেওয়া দরকার। ভবেশবাবু আরও খানিকক্ষণ ভাবলেন, তারপর দিক পরিবর্তন করে উলটো হেঁটে আবার বাজারে ফিরে এলেন।

বাজারের যেদিকে মাছওলারা বসে, এলেন সেইখানটায়। পরিচিত মাছওলা বাদল তখন ক্রেতাদের সাথে দরদস্তুর করতে ব্যস্ত। ভবেশবাবু এগিয়ে এলেন 'ভাই বাদল, আমায় পয়সা ফেরত দেওয়ার সময় দশ টাকা বেশি দিয়ে ফেলেছিলে, খেয়াল করিনি, এই গুণতে গিয়ে দেখলাম, নাও ধরো', বলে দশ টাকার একটা নোট বাদলের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বাদল অবাক হল। খানিকক্ষণ ভবেশবাবুর দিকে বিস্ময়ে তাকিয়েও থাকল। আজকের দিনে এমন লোকও আছে নাকি! এতক্ষণ পরে যেচে পয়সা ফেরত দিতে এসেছে!

ভবেশবাবু অবশ্য বেশিসময় নষ্ট করলেন না। টাকাটা ফেরত দিয়েই নিজের পথ ধরলেন। আধাঘন্টা আগে মাছ কিনে পয়সা ফেরত নেওয়ার সময়ই তিনি খেয়াল করেছিলেন তড়িঘড়িতে বাদল দশটাকা বেশি দিচ্ছে। তখন সৎ-অসতের কাটাছেঁড়ায় না গিয়ে বেমালুম টাকাটা পকেটে পুরে ফেলেছিলেন। এখন কেন যে আবার এতটা রাস্তা ফিরে এসে পয়সা ফেরত দিতে এলেন, তা তিনি নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছেন মনটা বেশ হালকা লাগছে এখন। অস্বস্তির খচখচে কাঁটাটা আর কামড়াচ্ছে না। এই ভুলটুকু শুধরে না-নিলে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরতে পারতেন না তিনি।

অনুরণন

প্রকাশ কর

আমাদের সবারই একটা ছোটোখাটো, ছিমছাম ছোটোবেলা ছিল। সেই ছোটোবেলার এক যে ছিল রাজা ছিলাম বোধহয় আমরা নিজেরাই। সেখানে অনেক বারণ ছিল, অনেক কিছুই নিষিদ্ধ ছিল যে-গুলো বড় না-হলে জয় করার অনুমতি ছিল না। গল্প চড়ে ঘুম নামত চোখে। ঘুম ভাঙত নিজের মতো। একটা মাদুর পাতা স্কুল ছিল। আজ যেটা দু-পা তখন সেখানেই ছিল হারিয়ে যাওয়ার ভয়। তারপর সেই ভয় ধীরে ধীরে একপা-দুপা করে কখন যে কেটে গেল টেরই পেলাম না। এখন ফেলে আসাগুলো পুরোনো অ্যালবাম আর খুচরো স্মৃতিতে মাঝেমাঝে ধরা পড়ে। বারবার যেটা মনে হয়, সমস্তটাই আসলে সিনেমার রিলের মতোই, সমস্ত কিছুই সেখানে একসাথে আছে আর আমরা দর্শকের মতো বর্তমানের পর্দায় সেগুলোই ঘটে যেতে দেখে চলেছি ক্রমশ। এই সিনেমাহলের মালিক হলেন 'সময়'।

সময়ের নিপুণ বুননে সবকিছু এত এত নিখুঁত, কোনো গোলমাল হওয়ার নেই কোথাও। তবুও যদি, হঠাৎ গোলমাল বাধে ...। বাড়ি ফিরে দেখি আমাদের পুরোনো রান্না ঘরে দিদা পিঠে বানাচ্ছে, নতুন গুড়ের গন্ধে সন্ধে নামছে, মা সন্ধে দিচ্ছে ...। গতমাসে না-জানা কারণে আত্মহত্যা করা ছেলেটা পাঁচিলের পিছনের ঝোপটায় লুকিয়েছে আর তাদেরই ভাড়াটে মেয়েটা তাকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে মাটিতে। দাদু ডাকছে আমায়, আর আমি সেই নীল সোয়েটারটা পরতে পারছি অনায়াসে, কিচ্ছুটি না ভেবে। কিন্তু ঠিক তখন কী আমার মনে হবে, অবিকল এরকমই একটা সন্ধেতে আমি আগেও যেন ছিলাম?

অনুভব

পাপিয়া মাণ্ডী

কিচির মিচির করতে করতে উড়ে চলেছে পাখিরা। একটা শুঁয়োপোকা সজনেগাছের ডাল বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। একটা চমৎকার প্রজাপতি ফুলেফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। সুমন তার দুখানা উৎসুক চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে এই মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল। প্রতি রবিবার ছুটির দিনগুলিতে সুমন প্রায়ই এই নদীর ধারটাতে বেড়াতে আসে। সপ্তাহের বাকি দিনগুলির থেকে এই দিনটিই যেন তার সবচেয়ে বেশি নিজের। প্রতিবারের মতো সে আজও সজনেগাছের তলায় বসে আছে। আজ তার চোখে সবচেয়ে বেশি আকর্ষক হয়েছে হলুদফুলে বসা প্রজাপতিটি। হঠাৎ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই একটা নিষ্ঠুর গিরগিটি তার লম্বা জিভ দিয়ে প্রজাপতিটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে নিল। সুমন কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। তার হাত-পা যেন ভয়ে অসাড় হয়ে গেল, তপনের কথা ভেবে। কারণ সেও তো স্কুলে সেদিন তাকে এভাবেই ধরে নিয়ে কী মারটাই না মারছিল, ভাগ্যিস তখন মিস্ এসে পড়ল . . . । না এবার কিন্তু সুমন মিস্ এর মতো প্রজাপতিটির রক্ষক হতে পারল না। কয়েকবার ঝটপট করেই প্রজাপতিটি গেল গিরগিটির পেটে। প্রজাপতির শোকে মুহ্যমান সুমন অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে- ফুঁপিয়ে কাঁদল। কাঁদতে-কাঁদতে সে একসময় ঘুমিয়েই পড়ল। ঘুমের মধ্যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল সে। একটা দ্বীপে হাজার-হাজার সজনেগাছ সবুজে সবুজ হয়ে আছে। সুমন একটা পাথরের উপর বসে সামনে ফুটে থাকা রঙিন ফুলগুলোর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। ফুলেফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে কত প্রজাপতি। হঠাৎ গাছগুলি যেন নড়ে উঠল। সুমন আঁতকে উঠে দেখল সেই পেটমোটা গিরগিটিটাকে, লোভে তার চোখদুটো চকচক করছে। পরক্ষণেই সে একটার পর একটা প্রজাপতি গিলে খেতে শুরু করল। আতঙ্কে প্রজাপতিগুলোও উড়ে পালাতে লাগল। ওই অসহায় প্রজাপতিগুলোর মধ্যে যেন সুমন নিজেকে প্রত্যক্ষ করল। হঠাৎ সুমন অবাক হয়ে দেখল শয়ে শয়ে শুঁয়োপোকা গিরগিটির সামনে দিয়ে চলেছে। কিন্তু গিরগিটি তাদের কোনোভাবে আঘাত করছে না। ওদের মধ্যে একটা শুঁয়োপোকা সুমনের দিকে এগিয়ে এসে মানুষের মতো কথা বলে উঠল। বলল, দেখলে তো সুমন, আমরা প্রজাপতির মতো উড়তে চাই, কিন্তু গিরগিটির হাত থেকে বাঁচতে, আমাদের শুঁয়োপোকার মতো জীবন বেছে নিতে হয়। আচ্ছা তুমি বল তো জীবনের কোন রূপটা নিতে চাও ... ? হঠাৎ একটি কাকের ডাকে সুমন চমকে উঠল। ঘুম জড়ানো চোখে, সামনের ফুলগাছটার দিকে তাকিয়ে দেখল — গিরগিটিটা তার দিকেই ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছে। সুমনের মনে হল তপনই যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। সুমন মুখে হুসহুস শব্দ করে গিরগিটির দিকে তেড়ে গেল।

শান্তির খোঁজে

রবীন বসু

এ এক প্রাচীন নাবিকের গল্প।

প্রাচীন বললাম, কেন-না বয়সের কোনো গাছপাথর নেই। একশ ছুঁই ছুঁই বয়সেও সমান তেজি কর্মঠ। রোদে-জলে পুড়ে পনেরো দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি বানিয়েছেন ছোট্ট একটা কাঠের ঘর। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে নদীর ধারে। ঘর বলতে একটা পাটাতন, কাঠের চারটে দেয়াল আর উপরে একটা ঢাকা। তাও একটু ফাঁক আছে রাতে তারা দেখার জন্য।

কর্মজীবনে মাল বোঝাই জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়তেন। এক ডক থেকে আর এক ডকে, এক দেশ থেকে অন্য দেশ। সে এক বিচিত্র ভাসমান জীবন। রাতের অন্ধকারে যখন বিশ্রাম নিতেন, কেবিনে নয়, ডেকের পাটাতনে শুয়ে পড়তেন। আর শুয়ে শুয়ে আকাশের তারা গুনতেন। অনন্ত অথই সে আকাশ পারাবার। কত তারা। কত বিচিত্র তাদের রং, রোশনাই। বৈভবে রাত কেটে যেত।

কাজ থেকে অবসর নিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছেন তা প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল। বড়ো একান্নবর্তী পরিবার রেখে স্ত্রী গত হয়েছেন তাও অনেকদিন হয়ে গেল। আর তারপর থেকে কেমন অবসাদে ভুগছেন। মনে একদম শান্তি নেই। সাংসারিক ব্যাপারে ছেলে-মেয়ে পুত্রবধূ নাতি-নাতনিদের সঙ্গে মতের মিল হয় না। এমনকি প্রতিবেশি তারাও বলে, আর কতদিন বাঁচবে বুড়ো? সম্পত্তি টাকা পয়সা সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে ঘাটে ওঠ!

ছেলেরা সব অলস, কাজ করতে চায় না, জমি পড়ে থাকে চাষ-আবাদ হয় না। বাপের সঙ্গে তা নিয়ে ঝগড়া। প্রাচীন নাবিকের মনে খুব দুশ্চিন্তা। শান্তি নেই। ভাবে, তার অবর্তমানে ছেলেদের কী হবে। কিন্তু এমাসের গোড়ায় ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়ায়। ছেলেদের সঙ্গে এতটাই মতের অমিল হয় যে, নাবিক সংসার ছেড়ে নিজের হাতে বানানো কাঠের এই ঘরে চলে এসেছেন। একা থাকেন। নদী থেকে মাছ ধরেন আর কাঠের জ্বালে ভাত মাছ রান্না করে খান। অন্ধকার রাতে তারাভরা আকাশে তাকিয়ে ভাবেন এই বেশ হল। নিত্যদিনের অশান্তির চাইতে এই চলে আসা ভালো। কদিন বাঁচবেন আর, একটু শান্তি চাই। কিন্তু নদীর নির্মল হাওয়া, খোলা প্রকৃতির কোলে কদিন থেকে নাবিক কেমন হাঁপিয়ে উঠল। মনে আবার দুশ্চিন্তা! ছেলেরা ঠিক মত জমিতে সেচ দিচ্ছে তো? পঞ্চায়েতে ট্যাক্স জমা করতে হবে, বাড়ির দলিল কোথায় রেখে এসেছে বলে আসা হয়নি। এটিএম কার্ড, রেশনকার্ড, আধার কার্ড সব কোন্ ফাইলে রাখল? সারারাত বিনিদ্র কেটে গেল। তারাভরা আকাশে একবারও তাকাল না। পরদিনও। এবার প্রাচীন নাবিক তল্পিতল্পা গুটিয়ে আবার বাড়ি ফিরে চলল। ছেলেমেয়েরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল, বাবা ফিরে এসেছে। বাড়ি আবার গমগম। যে শান্তির খোঁজে নাবিক বাড়ি ছেড়েছিল, দেখল তা বাড়িতেই আছে!

ভাইফোঁটা

চিরঞ্জিত সাহা

আটটা কুড়ির কাটোয়া-শিয়ালদা লোকালের এই বাদুড়ঝোলা ভিড় আজ নতুন নয়। জনতার চাপে ট্রেনের বিস্ফোরণ যেন কেবল সময়ের অপেক্ষা। এই ভিড় ঠেলেই ক্লাস ফোরের তিতাস একটা বসার জায়গা ট্রেনে খুঁজে নিতে সমর্থ হয়েছে অচেনা এক কাকুর কোলে। একরাশ আনন্দ আর আশার বুদবুদ নিয়ে ছোট্ট ছেলেটা আজ চলেছে মামার বাড়ি ব্যান্ডেলের উদ্দেশ্যে। পাশেই অতিকায় লাগেজ হাতে দাঁড়িয়ে তার রাশভারি মা। ভিড় ট্রেনের ঝাঁকুনিতে যাত্রীরা প্রায়শই একে অপরের গায়ে এসে পড়ছে আর ততোধিক বেগে সজোরে হেসে গড়িয়ে যাচ্ছে তিতাস।

'মা, দেখো, ওই লাল লাল লজেন্সগুলো কী সুন্দর দেখতে! একটা কিনে দাও না গো প্লিজ। আমি চুষে চুষে খাব।' ... বছর দশেকের এক লজেন্স বিক্রেতা কামরায় উঠতেই চেঁচিয়ে ওঠে তিতাস।
'ছি! হোয়াট রাবিশ তিতাস! ওগুলো চটধোয়া জল দিয়ে বানানো বাবা। জার্মের আঁতুড়ঘর। নেভার। স্টপ শাউটিং।' ... ধমক দেন তিতাসের মা।
'না, আমার ওই লাল লজেন্সগুলোই চাই। চাই। চাই। চাই। তুমি চুপ করো। ও লজেন্সদিদি! ও লজেন্সদিদি!' – কাঁদতে কাঁদতে অচেনা কাকুর কোল থেকে লাফ মারে তিতাস।
'অসভ্য ছেলে। এসব ছোটোলোকের খাবারেই তো তোমার নজর যাবে। রোজ মিল্কিবার গিলেও শান্তি হয় না, না তোমার? আজেবাজে বেকারির মাল যত!' – ঠাস করে তিতাসের গালে একটা চড় মারলেন ওর মা।

শোরগোল শুনে কমলা ফ্রকপরা, বছর দশেকের লজেন্স বিক্রেতা মেয়েটি ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে তিতাসের কাছে। হাসিমুখে নিজের ঝোলা থেকে এক প্যাকেট লজেন্স বের করে মলিন হাতে সে তুলে দিল ছোট্ট বাচ্চাটার হাতে – 'এই নে ভাই! তুই এটা খাস! আমার সোনাভাই।' আর তিতাসের মায়ের দিকে তাকিয়ে কাতরভাবে ছলছল চোখে বলল – 'কাকিমণি, আমি নিজে গিয়ে কারখানা থেকে এগুলো নিয়ে আসি গো, আমার লজেন্স নোংরা নয়। জানো তো, আমি না তখন খুব ছোটো! আমার পুঁচকে একটা ভাই হওয়ার পরই আমার মা আমাকে এই প্ল্যাটফর্মে রেখে চলে যায়, তারপর আর কিছুই মনে পড়ে না। এই নিয়ে মনে হয় বছর তিন হল, দিনেরবেলা ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে লজেন্স বিক্রি করি আর রাতে শুয়ে থাকি ওপাশের প্ল্যাটফর্মে। সবাই বলছে শুনছি, আজ নাকি ভাইফোঁটা; তাই ট্রেনে এত ভিড়। আমার নিজের ভাইটাকে যে সেই কোন্ যুগে দেখেছি মনেই পড়ে না; তাই আজ না হয় আমার এই ছোট্ট ভাইটাকেই লজেন্সটুকু উপহার দিলাম। রাগ কোরো না কিন্তু কাকিমণি।'

ট্রেন বাঁশবেড়িয়া ছাড়িয়ে ব্যান্ডেলে ঢুকছে। ট্রেনের হুইসেল যেন আজ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বাতাসে ভেসে আসা সহস্র ভাইফোঁটার শঙ্খধ্বনিতে। তিতাসকে নিয়ে ওর মা নেমে পড়লেন ব্যান্ডেল স্টেশনে। তিনিও ভাইকে ফোঁটা দেবেন যে।

আমায় নইলে তোমার চলে না

কৃপাণ মৈত্র

পয়লা বৈশাখের দিন রামতনুবাবু খুব সকাল সকাল উঠে সোজা গেলেন ঘাটে স্নান করতে। আচমন করলেন। ঘাট থেকে উঠে এসে গেলেন বাগানে। বাগান থেকে ফুল তুলে শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন ধরালেন। একখণ্ড লোহা গরম করে ছোঁয়া নিলেন। পাখিরা তখন কুঁড়ি থেকে পাপড়ি মেলার মতো পাখা মেলে আকাশ-বাগানে বিহার করতে বেরিয়েছে। পুবের হলুদ আভা ভেদ করে গোলাপের মতো লাল সূর্য সবে ফোটার উদ্যোগ নিচ্ছে। রামতনুবাবু গেলেন ঠাকুরঘরে। ফুল দিয়ে ঠাকুরঘর সাজালেন। ঠাকুরের সামনে জল-ধূপ দিলেন। তিনি যখন পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি করছিলেন এমন সময় বাইরের ফটকের দরজায় একটা শব্দ। একবারই মাত্র। এত সকাল বেলায় কে হতে পারে! স্ত্রীর তো সকালে ওঠার অভ্যাস নেই। তাছাড়া দরকার হলে তিনি দরজায় শব্দ করবেন কেন। রামতনুবাবু কোনোভাবেই পুজোয় মনঃসংযোগ করতে পারছেন না। আরতির ষোলো পর্যায়ে কোথায় যেন খামতি থেকে যাচ্ছে।

নীচে নেমে সোজা গেলেন ফটকে। দেখলেন এক শতছিন্ন পোশাক পরা ও দাঁড়ি গোঁফে মুখ ঢাকা মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি বসে আছে। এমনিতেই শব্দের কারণে তাঁর মেজাজ বিগড়ে ছিল। ভালো করে পুজো করা হয়নি। এমন কদাকার লোককে দেখে তিনি বিরক্ত হলেন। বললেন, কী চাই? এত ভোরে কি ভিক্ষা করার একটা সময়? বছরের প্রথম দিন বলে কথা, তোমার মতো লোকের মুখ দেখতে হল।

লোকটি জঙ্গলময় মুখের মধ্য থেকে ধূর্ত শিয়ালের মতো দাঁত বের করে বলল, আজ্ঞে, কার মুখ দেখলে আপনি খুশি হতেন?

রামতনুবাবু বললেন, সকালটা ঈশ্বরের।

লোকটি হেসে বললো, ঈশ্বর সত্যিই দেখা দিলে চিনতে পারবেন তাঁকে?

রামতনুবাবু বললেন, আর যাই হোক, তোমার মতো কুদর্শন হবেন না তিনি।

— তবে যে বলে সর্বভূতে তিনি বিরাজ করেন। রামতনুবাবু চমকে উঠলেন। সকালবেলায় আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে যাব না।

লোকটি বলল, কী যে বলেন। তর্কে বহুদূর। এই যেমন ধরুন পুজোর নামে ফুলগুলোর কয়েক ঘন্টার পরমায়ু কেড়ে নিলেন। এর কি কোনো মানে হয়?

রামতনুবাবু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তুমি তো সর্বজ্ঞ। লোকটি মুখ নামিয়ে বলল, ঈশ্বর নিজেই সর্বজ্ঞ নন। আমি তো কোন্ ছার।

রামতনুবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, বছরের প্রথম সকালে তোমার মুখ দেখতে হল হে। জানি না ভাগ্যে কী আছে।

লোকটি বলল, আমারও প্রথম দর্শন আপনি। ভেবেছিলাম অপার্থিব কিছু পাব। কিন্তু আপনি তো ভিখারিরও করুণাপাত্র হওয়ার যোগ্য নন।

রামতনুবাবুর শরীর তখন রাগে কাঁপছে। তিনি চিৎকার করে বললেন, পাষণ্ড দূর হ।

লোকটি হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু আমায় নইলে যে তোমার চলে না।

লোকটি ব্যঙ্গের হাসি হেসে চলে গেল। রামতনুবাবু হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সঞ্জয় গায়েন

মাটি

— ও পটুয়াকাকা, এবার আমরা ভালোবাসার পুজো করছি। তোমাকে প্রেমের ঠাকুর গড়ে দিতে হবে।

— তা তো পারব না।

— সে কী! কেন?

— তেমন মাটি আর নেই গো।

লজ্জা

– দুই হাতে মুখ ঢাকা পুরুষের ছবি এঁকেছ কেন!

– আপনি যে বললেন ধর্ষণ বিষয়ক নিউজের ছবি চাই।

– হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি।

– আমি তো তাই এঁকেছি। ধর্ষণে যাদের লজ্জা পাওয়া উচিত তাদেরই মুখ ঢেকেছি।

মাটির মানুষ

– মাটির মানুষ মানেই বুঝি ভালো মানুষ?

– হুম। তাই তো জানি।

– ভুল জানো।

– কেন?

– ভুলে যেয়ো না মাটিও রং বদলায়।

নূপুর

শোভন মণ্ডল

রতন চোখ মেলতে পারে না। এই এক সমস্যা! দিনের আলো ফুটলেই রতনের যেন কেমন হয়। ভালো করে তাকাতে পারে না, মাথা ঝিমঝিম করে, সারা গা ম্যাচ্ ম্যাচ্ করে। কিছুতেই যেন বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। রতন ভালো করে বালিশটা জড়িয়ে ধরে আর একটু ঘুমানোর চেষ্টা করে। চোখটা জুড়িয়ে আসছিল, হঠাৎ দুফোঁটা জল গায়ে পড়তেই তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। বাইরে তাকাতেই বুঝতে পারল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। রান্নাঘর থেকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি এনে যেখান থেকে জল পড়ছিল তার তলায় রাখল। টালির চাল অনেকদিন সংস্কার করা হয়নি, তাই বৃষ্টি এলেই সমস্যায় পড়ে যায় রতন।

আজ আর ঘুম আসবে না। বাড়িতে কোনো ঘড়ি নেই, কিন্তু রতন বেশ বুঝতে পারল বেলা এখন অনেক। নিমডালের দাঁতন দিয়ে দাঁতটা মেজে বারান্দায় বেতের মোড়াটায় বসল। বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে। আজকে আর কেল্টুর দোকানে গিয়ে রুটি আলুরদম খাওয়া যাবে না। বাড়িতে সে ছাড়া আর কেউ থাকে না। বউ অন্য একজনের সঙ্গে পালিয়েছে। মেয়েটাও দুবছর আগে একজনকে বিয়ে করে কেটে পড়েছে। কারোর সঙ্গে আর তার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। কে কোথায় থাকে সে কখনও জানতেও চায়নি। মেয়ে তো তাকে বাবা বলে মানতেই চায় না। তা যাক গে! রতনের এসব নিয়ে এখন কোনো মাথাব্যথা নেই। একা একা দিব্যি আছে!

একটা বিড়ি ধরাল। তারপর ঘরের ভেতর থেকে একটা থলি নিয়ে এসে গিঁট খুলল। কী কী নিয়ে এসেছে রাতের অন্ধকারে ভালো করে ঠিক ঠাওর করতে পারেনি। গতকাল রাতে সে গিয়েছিল দশমাইল দূরে গোপালপুর গ্রামে। একটা দোতলা বাড়ি দেখে ঢুকে পড়েছিল গভীর রাত্রে। অনেকগুলো ঘর থাকলেও একটার বেশি ঘরে সে ঢুকতে পারেনি। সেখান থেকে যা পেরেছে নিয়ে এসেছে। তাও কম নয়! দুদিন রাতে না-বেরোলেও চলে যাবে তার।

থলি খুলে ভালো করে দেখতে লাগল। হাজার খানেক টাকা, একটা হাতঘড়ি, একটা দেয়ালঘড়ি, ভাঙা তিনব্যাটারিটর্চ, কয়েকটা শাড়ি আর একটা রুপোর নূপুর। রতন সবকিছু সরিয়ে রেখে নূপুরটা হাতে নিল। বেশ পুরোনো। একটু কালচে ভাব চলে এসেছে। আর ডিজাইনটা তার খুব চেনা। মনু সেকরার কাছে করানো।

আজ থেকে দশবছর আগে তার মেয়ে যখন এইটা পরে ঘুরে বেড়াত একটা মায়াবী ছমছম শব্দে গোটা ঘর ভরে থাকত।

সেই শব্দ যেন এখনও সে শুনতে পাচ্ছে।

বাজে খরচ

দীপককুমার মাইতি

অলক বইপ্রেমী। বেতন পেলে সে প্রতিমাসে নিয়মিত বই কেনে। বাড়িতে একটা মিনি লাইব্রেরি গড়ে তুলেছে। একটি বিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষকতা করে। বিদ্যালয়ের কাজের পর ওর ঠিকানা নিজের পড়ার ঘর। উর্মিমালার সাথে বিয়ের সম্বন্ধ আসে। শিক্ষিকা উর্মিমালা বাংলায় প্রথম শ্রেণির এম. এ.। অলক উর্মিমালাকে না-দেখেই বিয়েতে রাজি হয়।

বিয়ের পর প্রথম শারদীয়া পূজা। বাপের বাড়ির সকলকে নতুন জামাকাপড় দেওয়ার কথা বলে উর্মিমালা। রাজি হল অলক। অলক বলে, আমি জামাকাপড় কেনাকাটার কিছু বুঝি না। তুমি কাকলিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

উর্মিমালা জেদ ধরে সঙ্গে যাওয়ার জন্য। বাধ্য হয়ে অলক রাজি হয়। কাকলির পরামর্শে সকলে একটি বড় মলে আসে। মলে ঢুকেই অলক দেখে একটি বুকস্টল। ডেবিট কার্ড উর্মিমালাকে দিয়ে বলে, তোমরা কেনাকাটা করো। আমি এখানে বই দেখি।

কাকলি, হতবাক উর্মিমালাকে বলে, বউদি দাদাকে এখান থেকে নড়ানো কঠিন। চলো আমরা কেনাকাটা সেরে ফেলি।

বই দেখতে দেখতে কখন সময় কেটে গেছে বুঝতে পারেনি অলক। কাকলির ডাকে তাকিয়ে দেখে ওরা দুজন কয়েকটা ভারি ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে। উর্মিমালা বলে, অনেক খরচ করে ফেলেছি। প্রায় কুড়ি হাজার। একটা কাতান সিল্ক খুব পছন্দ হল। নিজের জন্য নিলাম। ওটাই সাত হাজার।

— ঠিক আছে। এখন কি ফিরবে?

— হ্যাঁ। তোমার হাতে কীসের প্যাকেট।

— দুটো শারদীয়া সংখ্যা কিনলাম। কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের লেখা আছে। দাম মাত্র একশো টাকা।

— একটা ট্যাক্সি ডাকো।

অবাক হয়ে অলক বলে, ট্যাক্সি কেন? এইটুকু রাস্তা। যেমন অটো করে এসেছি সেভাবেই ফিরলে হয় না?

উর্মিমালা রেগে বলে, এতগুলো ভারি ব্যাগ নিয়ে আমরা অটোতে যাব? ট্যাক্সি ডাকতে কিপটেমি করছো? অথচ নিজে একশো টাকা বাজে খরচ করলে। ওই টাকাতেই ট্যাক্সি হয়ে যেত।

রাগে গজগজ করতে করতে কাকলিকে নিয়ে উর্মিমালা বেরিয়ে যায়। হতবাক কমল বাজে খরচের প্যাকেট বুকে জড়িয়ে ওদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আলোর ভুবন
নিরাশাহরণ নস্কর

এক

— ভাইপো, এবাড়ির ছোটবৌয়ের নজর যে শুধু তোর ওপর কী ব্যাপার বল তো?
— ধ্যাৎ, কী যে বলো কাকা! কেমন যেন একটা লজ্জা-আড়ষ্টতা ছুঁয়ে থাকে সতুকে।
— শুধু কী খাওয়াদাওয়া কাকা, আমরা যখন কাজে বেরুই, কাজ থেকে ফিরি, টিফিন করি সবসময়ই তো দেখি ওই বউটা সতুকে নজরে নজরে রাখে। জানো, ও বোধহয় সতুকে ভালোবেসে ফেলেছে। ওকে কিছু বলতে চায়। তুমি কিন্তু এখানে আমাদের গার্জেন কাকা! তোমাকেই কেসটা দেখতে হবে। কেমন যেন রসালো ভঙ্গিমায় চোরা হাসির মধ্য দিয়ে কথাগুলো বলে রামু। সতুর ভালো লাগে না। সে রেগে গিয়ে বলে, এই তুই চুপ কত্তো।

কদিন এভাবেই চলছে এদের মিঠেকড়া আলাপসালাপ। এরা মানে সতু, রামু, উদ্ধব আর নিতাইকাকা। নিতাইকাকার বয়স পঞ্চাশের ঘরে হলেও বাকিরা ওই বাইশ-চব্বিশের খোপে। এরা আসলে দিনমজুর। এবছর মৌসুমির খামখেয়ালিপনার জন্য নিজেদের মগরাহাট এলাকায় বৃষ্টি না হওয়ায় এরা এসেছে কিছুটা দূরবর্তী ডায়মণ্ডহারবার এলাকায় খেপমজুর হিসাবে রোয়াদাওয়ার কাজ করতে। কুলবেড়িয়া গ্রামের সম্পন্ন চাষি রথীন ঘোষের বারবাড়িতে এদের অস্থায়ী আস্তানা। কাজ তাঁরই জমিজমায়। সকাল-সন্ধ্যায় জলপানি আর দুপুর রাতে দুবেলা খাওয়া বাদে দৈনিক মজুরি জনপিছু দুশো টাকা।

দুই

আজই এ বাড়ির কাজ শেষ হয়েছে। কাল সকলেই তারা রওনা দেবে বাড়ির উদ্দেশ্যে। রাতে 'দাওয়াসারা'র খাওয়াদাওয়া চলছে। সমস্ত জমির রোয়াগাড়া শেষ হলে এদিকের চাষিরা 'দাওয়াসারা' নামক এই ধরনের বড়ো একটা ভোজের আয়োজন করে থাকে। ছোটোবউ একা হাতে নিবিড় আন্তরিকতায় সকলকে পরিবেশন করলেও সতুর প্রতি তার নজর বরাবরের মতো একটু বেশিই।

রাত গড়িয়ে সকাল হয়েছে। সকাল গড়িয়ে সন্ধে। এ কদিন সতুর মাথার ভিতর ঘুরেছে এই একটা বিষয়। কেন এই মেয়েটা আমাকে এত যত্ন করে? কেন আমার প্রতি তার এত খেয়াল, এত আন্তরিকতা? কাজের সময়, জিরোনোর সময়, কাজ ছাড়ার অবসরে সতুর মনে এমন নানা প্রশ্ন ঘুরেছে, কিন্তু সমাধানসূচক কোনো আলোর সন্ধান সে পায়নি।

খাওয়া শেষে সতুর এঁটো হাতে জল ঢেলে দিতে এগিয়ে আসে ছোটোবউ। সেই সুযোগে খুবই আস্তে সতু জিজ্ঞাস করে, আমার প্রতি আপনার এত সদয় হওয়ার কারণটা একটু বলবেন?
— আজ রাতে আমার ঘরে আসুন, উত্তর দেব। এক ঘন্টা পর গেটের কাছে আসবেন আমি আপনাকে অন্দরে নিয়ে আসব।

শোনা ইস্তক হাঁটু কাঁপছে সতুর। বুকের ধকধক শব্দটা যেন বাইরে থেকেই বাকিরা শুনতে পাবে! কী করবে সে বুঝে উঠতে পারে না। ওর স্বামী কি আজ ঘরে নেই? এই বিদেশ বিভুঁইয়ে কী বিপদেই না পড়বে সে ভেবে ভয় পায়। কিন্তু উত্তরটা জানার কৌতূহল তাকে সাহসী করে তোলে।

ঘন্টাখানেক পর রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ সদর দরজা খুলে ছোটোবউ সতুকে

দোতলায় তার ঘরে নিয়ে যায়। ঘরে ঢুকেই সতু আরও অবাক: খাটের উপর বাবু হয়ে বসে এ বাড়ির ছোটোছেলে। তিনিই বললেন, এসো সতুদা, বসো।
সম্বোধনটা কেমন অস্বাভাবিক ঠেকল, সতুর ... একজন অজ্ঞাতপরিচয় জনমজুরকে কিনা 'দাদা' সম্বোধন!
— দ্যাখো অবাক হওয়ার কিছু নেই। তিনি বলতে থাকেন, আমার স্ত্রী সুমনারা দুই ভাইবোন। ওর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো ওর দাদা আমাদের বিয়ের কয়েকদিন পর একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। তাকে দেখতে ঠিক তোমার মতো ... হুবহু একইরকম।
— কাল তো চলে যাবে দাদা, জানি না আর কোনোদিন দেখা হবে কিনা। তোমার জন্য এই সামান্য উপহার। প্লিজ গ্রহণ করো দাদা। সুমনা কাঁদছে। উপহারের প্যাকেটটা হাতে দিয়ে সে সতুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। আর তাকে দুই মমতামাখা হাতে তুলতে তুলতে সতু দেখছে চরাচর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কুয়াশা যাচ্ছে সরে ... আলোয় আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘর-দোর-আঙন ...

আঁধার

সুমনকুমার নায়েক

সামনের চাপ-চাপ অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে নিষ্পলক বসে আছে মালতি। মানুষটা এখনও বাড়ি ফিরল না! ভোটের মরশুমে সেই ভোর-ভোর পার্টির হয়ে খাটতে গেছে সদরে। বলে গেছে, বিকেল বিকেলই ফিরে আসবে। সেই বিকেল এখন সন্ধে গড়িয়ে মাঝরাত! ফোনটাও সমানে সুইচ অফ বলছে!

মেয়েটা বিকেল থেকেই ঘ্যানঘ্যান করছিল, 'বাবা এখনও আসছে না কেন, মা... আমার জন্য মোরব্বা আনবে বলেছিল...' রাতেও কান্নাকাটি করছিল, খেতে চাইছিল না। মালতি ধমকধামক দিয়ে যা হোক দু-এক গ্রাস খাইয়েছে। তারপর বিছানায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লে জাহাঙ্গিরচাচার বাড়ি গিয়েছিল মালতি। মানুষটার যদি কোনো খবর পাওয়া যায়!

ওকে দেখেই চাচা বলেছিল, 'অশোক এখনও ফেরেনি!! ...ওখানে মিছিলে বিশাল ঝামেলা হয়েছে ... বিরোধীরা গুলি চালিয়েছিল ... আমাদের পার্টির কে একজন যেন মারা গেছে শুনলাম ... কোনোরকমে আমি পালিয়ে এসেছি... আমি দেখছি, প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কিনা! ... অশোকের কোনোও খবর পেলেই তোমাকে জানাচ্ছি...'

সেই থেকেই মনটা কু-গাইছে মালতির! অজানা এক আশঙ্কায় থেকে-থেকেই কেঁপে-কেঁপে উঠছে! দূরে কালো শিরিষ গাছটার চারপাশে কতগুলো জোনাকি মিটমিট করে উড়ে বেড়াচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎই একসময় মালতির মনে হল — পাশের মেঠো রাস্তাটা দিয়ে আবছা আবছা কে যেন এগিয়ে আসছে! হাতে কী বিড়ির আগুন!

নড়েচড়ে বসল মালতি। অন্ধকারেই চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থাকল সেদিকে – অন্ধকারের মানুষটাকে চেনার জন্য...!

পাড়ি

উত্থানপদ বিজলী

মোহনার কাছে বাড়ি
অহরহ শুনি কানে সমুদ্রগর্জন
এক অমোঘ হাতছানি
দিতে হবে পাড়ি।

সবুজ গাছেতে ঘেরা একখানি ঘর
সারাদিন পাখি ডাকে, করে কোলাহল
প্রতিবেশি যারা আছে তারা সব কাজে
বিকেলের রোদ হাঁটে এদিক ওদিক
মন্থর গতিতে ...

বুঝেছি এখন আমার দিতে হবে পাড়ি
ছেড়ে দিয়ে এত সব, ছেড়ে ঘরবাড়ি
সাত তাড়াতাড়ি।

নীরবতা আসলে ভূমিকা

সোমনাথ বেনিয়া

প্রিয়তমা, বুকের কাছে ভালোবাসা ছুরি হয়ে আছে
ধারালো প্রান্তে দৃষ্টি পড়লেই বুটিবুটি
হৃদয়ের মুখে সুচালো শীর্ষ রাখে চুম্বন
চঞ্চলতার লোহিত অভিধানে প্রথম শব্দ, অভিবাদন
নষ্ট পুরুষের কোনো মানচিত্র নেই, জানো
তাই যত্রতত্র খননে কিছু না-পেলেও, আনন্দ থাকে
সীমারেখা পেরিয়ে তুষের আগুন যায় রাখা
পোড়া পৃষ্ঠা ফুরায় নতুন বাক্যবিন্যাসে
যদি কিছু লিখতে চাও, প্রিয়তমা ...
অক্ষরে বিভোর বসিয়ে বাতাসে দাও অন্তিম অভিঘাত
যে দাঁড়াবে চুপ, বুঝবে, নীরবতা আসলে ভূমিকা
আংটি উজ্জ্বল হতে জড়িয়ে ধরে অনামিকা ...

অভিমানী

সঞ্জীব সেন

ভোরের ঘাসের মত মেয়ে গমের মত অভিমানী
হেরে গেছে কিশোরের আঙুল ছুঁয়ে প্রেমে-অপ্রেমে
আমি প্রেমের বিকল্প খুঁজতে এসে অপরিচিতাকে
কেন যে অসামান্য প্রেমগাথা উপহার দিয়ে গেছি,
অপরিচিতা মেয়েটি এমন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়েছিল
অপরিচিতকে চমকে দেবে বলে, দস্যুতা চেয়ে,
যে মেয়ে ছিল অভিমানী অভিমানে পুড়ে হবে ছাই
একদিন দেখব সে সরোবর খুলে পাখি হয়ে আছে
আমি লিখেছি এক নারীর নাব্য নদীকথা
একদিন শস্য ছুঁয়েছি ভোরে সূর্যমুখী ভেবে,
নারীরা অভিমান ভেঙে আসে যদি কোনোদিন
আগুনে পুড়ে ছাই থেকে জন্ম নেয় ফিনিক্স পাখি।

আমি

বিদ্যুৎ মিশ্র

কেন জানি না সেরকম ভাবে নিজেকে আর
খোলা আকাশের নীচে দেখতে পাই না।
কংক্রিটের শহরে নিজেকে ভীষণ বন্দি মনে হয়।
চারপাশে অক্টোপাশের মতো উঁচু উঁচু দেয়াল
আমাকে গিলে খেতে চায়। আমি ভয়ে আরও বেশি
কুঁকড়ে যাই। চোখ বুজে ফেলি ভয়ে।
এখন আর আগের মতো হাসতে পারি না।
সবদিক থেকে কুন্ডলী পাকিয়ে বিষাক্ত বাতাস ছেয়ে ফেলেছে
আমি একটু অক্সিজেনের জন্যে হাঁপিয়ে যাই।

প্রযত্নে অন্ধকার

সঙ্গীতা মাইতি

কতগুলো পূর্ণিমা চাপা পড়ে গেল পায়ের তলায়
আর তুমি ন্যাপকিনের বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে
তেজপাতার রহস্যে ভিজছ।
যেতে যেতে বরং শুনে নিও
মেয়েটার ছিবড়ে হয়ে যাওয়া শিরাগুলোর পায়চারি,
কিংবা একটা সেফটিপিন গাঁথা সন্ধ্যার ক্ষয়িষ্ণু স্পন্দন।

আরো একটু এগোলেই চুলের ঠিকানা
প্রযত্নে — অন্ধকার।
তুমি ওখানেই গুঁজে দাও নুয়ে পড়া ঘাড়
বোতাম ঘরে আটকে যায়
নিঃশব্দ উচ্চারণের দাপাদাপি।
মুখস্থ কথার মতো ব্যথারা
ঢেকে নেয় বিপদসীমা
তখনই ম-ম করে ওঠে কষা মাংস।
অথচ বেঁচে থাকার সবটুকু গন্ধই বাস্তুচ্যুত!

টকটকে লাল চাঁদটা মঞ্চে নামলে,
ওর কলঙ্কগুলোয় হাত বুলিয়ে দেখো
ওখানেই সঞ্চিত আছে
শতায়ু স্বপ্নের অন্তিম শ্বাস!

শব্দের খেলাঘরে

বিকাশরঞ্জন হালদার

বের করে আনলাম যতকিছু
চাঁদের ঘাম, পর্দাসরানো পাতলা আলো
খাদ আর খাদের চূড়ান্ত কিনার।

ক্ষণকালটুকুর ঘেরাটোপে
ঘোরে ফেরে সম্বিৎ।

সন্ধ্যাতারার সুগন্ধ বয়
শব্দের খেলাঘরে

রাত্রি নামতে বোধহয় বেশি দেরি নেই
আমার মন বলে ...

পুরোনো বাড়ি ভাগ

শ্রী স্বেয়তী

গড়াতে গড়াতে সামিল হলাম প্রাগৈতিহাসিক বিস্ময় চিহ্নের নিকট। বৃষ্টিজল আঁকা কাদা পেরিয়ে অনন্ত উল্লাসের স্নান আলোয় ডুব সাঁতারে ভাসছি আমি। তারাখসা সেই ইট, সেই তৃণ, সেই প্রহর, কুয়াশা ছড়ানো ভোর। অনুভূতিহীন খুচরো স্মৃতির বিছানায় অপেক্ষার ডাকপিয়নের চিঠি এখন ঝরে পড়া পাপড়ি। চেঁচিয়ে বাড়ি-মাথায়-করা ডাকনামের পদবি এখন নড়বড়ে শ্যাডো। এখানে হাত-পা ছড়াছড়ি খায় যেদিকে পৃথিবীর কোল গড়িয়ে যায়।

চলন্ত কমলালেবুর এক নরম কোণের বারান্দায় এখন আনন্দরস বন্ধ্যা। বিপথগামী ফুলবাগানের চৌকাঠে জমাট বাঁধা কিছু পদচিহ্নের সন্ধ্যা। সবমিলিয়ে বিষের ছোবল। যেখানে পাখিদের এপার ওপার আমার বসন্তসম।

স্তব্ধতার অন্দরমহলে

রাবণ

হারিয়ে যাব ক্লান্ত
ঝাউবনের ছায়ায় একদিন
তোমার আঁচলের প্রপাত আর
ছোঁবে না আমায়

হয়তো হারিয়ে যাব
মেট্রোরেলের ভিড়ে...

অতর্কিতে মোমবাতির আর্তচিৎকারে
মিথ্যা অন্বেষণে

আমপাতায় ঢাকা মঙ্গলঘটে
মাঙ্গলিকতার কুসংস্কারে
ভেজাব নিজেকে আমি

তোমাদের বেসুরো গানের আসরে
আর থাকব না হে
থাকব স্তব্ধতার অন্দরমহলে ...

মুদ্রা
জহর মিত্র

তুমিই অর্থ তুমি অনর্থ পৃথিবীর মহাকাল
চারিদিকে তুমি বিছিয়ে রেখেছ স্বার্থের বোনা জাল।
তোমারই বলে হয়ে বলীয়ান সবকিছু পায় যারা,
দুরাচারী হয়ে আইন ভেঙেও পার পেয়ে যায় তারা।
তোমার দয়ায় পুষে রাখে তারা গুন্ডা ও মস্তান,
তোমার জোরেই করে তারা কত সংসার খানখান।
কত পাপ আর কত অন্যায় করে তারা অনায়াসে
বিচারের শেষে তোমার আশিসে তৃপ্তির হাসি হাসে।
যত অনাচার যত অবিচার অন্যায় হাহাকার
তুমি না থাকলে চলত না এই মিথ্যার কারবার।

জানি তুমি ছাড়া জীবনযুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়
তুমি না থাকলে আলোহীন দিনে কেবা দিত বরাভয়?
মন্দির মসজিদ বা গির্জা কিংবা গুরুদুয়ার
তুমি না থাকলে কোথায় থাকত গড়ত কি কেউ আর?
তুমি না থাকলে অসুখবিসুখে প্রাণ হবে সংশয়
চিকিৎসা বিনা অমৃত-পুত্র তিলে তিলে হবে ক্ষয়।
তোমার অভাবে দুমুঠো অন্ন উঠবে না কারও মুখে
নিশ্চিত জানি তোমার বিরহে থাকবে না কেউ সুখে।
তুমিই তো আদি তুমিই অনাদি তুমিই আবহমান
তুমিই সৃষ্টি তুমিই ধ্বংস তুমিই তো ভগবান . . .

একটি তাও (Tao) উপদেশ
অনীশ খ্যাপা

মুদ্রা যদি পাগল বানায় তোকে
ভোগায় যদি নিরাপত্তার মোহ
হারাবি তোর মোহন হৃদয়টিকে
আগলে রাখবি বিশুদ্ধ সন্দেহ

মানতে গিয়ে জনরুচির দায়
নিছক হবি পোষ্য সামাজিক
মনপ্রভু তোর যে পথে দেবে সায়
চলবি সটান নিষ্ঠ পদাতিক ...

রোমান কিসিওভ-এর কবিতা
ভাষান্তর : সৈকত ঘোষ

১৯৬২তে বুলগেরিয়ার কাজানলাক শহরে রোমান কিসিওভ (Roman Kissiov)-এর জন্ম হয়। তিনি কবি, অনুবাদক ও প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী। সোফিয়ার ন্যাশনাল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সোফিয়া, ভিয়েনা, বার্লিন, বুলগেরিয়া, ইতালি, ম্যাসেডোনিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প প্রদর্শনী ও কবি সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। রোমান কিসিওভের প্রায় সমস্ত কবিতাই বুলগেরিয়ান সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কবিতা ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইতালিয়ান, রাশিয়ান, পোলিশ, রোমানিয়ান, ডাচ, ডেনিশ, গ্রিক, তুর্কি, ক্রোয়েশিয়ান, সার্বিয়ান, বসনিয়ান, ম্যাসেডোনিয়ান, আলবেনীয়, আর্মেনিয়ান, জর্জিয়ান, আরবীয়, হিব্রু, চিনা, বাংলা, হিন্দিসহ বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল – The Doors of Heaven (1995), The Shadow of the Flight (2000), Pilgrim of the Light (2003), Cryptus (2007), Voices (2009), The Garden of the Secrets (2014), Eggs of phoenix (2014), The Mystic Rose – selected poems (2016).
সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি ন্যাশনাল পোয়েট্রি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন।

তাঁর কয়েকটি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করা হল। কবিতাগুলিকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই অনুবাদ করা হয়েছে।

AUTUMN MYSTERY
রহস্য

মৃদু বাতাসে জেগে উঠে বনানী
গেয়ে নেয় রমণীয় গান
ঝরনা নেমে আসে ভূতলে
জঙ্গল জুড়ে ঝরা পাতারা,
মলিন পালকও ঘোরে চারপাশ
দেখিনি গাছেদের আড়ালে
বসে ছিল দুঃখের পরিরা।

THE WIND IS TEACHING
শিক্ষা

এ শিক্ষা দিয়েছে শুধু হাওয়া
চারাগাছ হয়ে প্রাচীন বৃক্ষের কাছে নতজানু হয়ে থাকা।

FOOTPRINTS
পদচিহ্ন

তুষার খেতের উপর এক পদচিহ্ন,
দিগন্তে ভেসে ওঠে যেন।
এক অমানব চিহ্ন ছায়া,
কিংবা মানবিক ঘোর।
দিগন্তে খতিয়ে দেখি জাঁকিয়ে বসে আছে স্পষ্টত জন্তুমানব।

THE POET CAN
কবি

ওরা বলল,
পরিবারকে ভালোমন্দ খাওয়াতে পারবে না তুমি কবি।
ওরা বলল,
কৃমি আর কীটেদের ভোজন যোগাবে তুমি কবি।
না না,
ঘরকুনো কবুতরদের খুদকুঁড়ো হয়ে যান তিনি কবি।
গ্রামীণ গল্পের মতোই ঈগল আর পরিদের খাওয়াতে থাকেন তিনি।
কবি হৃদয় খাওয়ান,
সত্য ও আলোর জন্য ক্ষুধার্ত সেই বিশ্ব হৃদয়
পাঁচ স্তবকেই হাজারো ব্যঞ্জন খাওয়াতে পারেন তিনি কবি।

GENEROSITY
বদান্যতা

ভেসে যাওয়া কোনো এক শরতের রাতে
সম্বলহীন খুঁজে নেয় নিজের আশ্রয়।
গাছের তলায় নামে রাতের সংসার
সোনার পাতাগুলো এসে টুপটাপ বৃষ্টি নামায়।

মগের মুলুক: একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান অথবা বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গির যুগলবন্দি

চন্দন মিত্র

মগ-মগরা-মগরাজপুর

মগের মুলুক আমাদের একটি অতি পরিচিত প্রবাদ। অরাজকতা বা নৈরাজ্য বা গাজোয়ারি ভাব বোঝাতে আমরা কথায় কথায় প্রবাদটি ব্যবহার করে থাকি। বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনায় বা সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে আমরা প্রবাদটিকে পাই। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* নাটকে সাবিত্রীর সংলাপে দেখি — 'মগের মুলুক আর কি – ইংরেজের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।' সম্ভবত এটাই প্রবাদটির প্রথম সাহিত্যিক-প্রকাশ। ১৮১০-১৫ সালের দিকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের রামদুলাল পাল দেব মহন্ত ওরফে লালশশী তাঁর একটি গানে জাতধর্মের অসারতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন —

'ভাই রে মগ ফিরিঙ্গী ওলন্দাজ হিন্দু-মুসলমান
এক বিধাতা গড়েছেন বস্তু যা আছে সব দেহে সমান।'

আবার ১৮৫৮ সালের দিকে ঈশ্বরগুপ্ত একটি কবিতায় লিখছেন —

'নয় মগ ফিরিঙ্গী বিষম ধিঙ্গী
ভিতর বাহির যায় না জানা।।'

১৮২০ সালের *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় পাওয়া যায় — 'মঘ দেশীয়েরদিগকে বসতি করাইয়াছে যেহেতুক মঘেরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে।' লালশশী বা ঈশ্বরগুপ্ত কথিত 'মগ' ও এই 'মঘ' একই অর্থবোধক এবং শব্দটি জাতিবাচক। সুতরাং বুঝতে আর অসুবিধা রইল না যে 'মগের মুলুক' কথাটির আক্ষরিক অর্থ মগজাতির মুলুক বা দেশ। শুধু সাহিত্য বা সংবাদে নয় 'মগ' শব্দযুক্ত স্থাননামও আমাদের দুই বাংলায় আজও বিদ্যমান। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মণ্ডহারবার থানার একটি গ্রামের নাম মঙ্গরাজপুর বা মগরাজপুর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর থানারও একটি গ্রাম মগরাজপুর। আবার কেউ কেউ হুগলির মগরা বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগরাহাট নামের মধ্যে 'মগ' শব্দটির প্রভাব খুঁজেছেন যদিও সুকুমার সেন 'মগরা' শব্দের উৎস হিসাবে 'মকর' (গঙ্গাদেবীর বাহন) শব্দটিকে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাদেশে রয়েছে মগবাজার, মগবস্তি, মগপুকুরিয়া ইত্যাদি মগযুক্ত স্থাননাম। এই যে 'মগ' শব্দটির বহুল প্রয়োগ তা প্রমাণ করে আমরা নিকট অতীতে মগেদের সংস্পর্শে এসেছিলাম।

আরাকান: মগের মুলুক, মগের দেশ

বিভিন্ন অভিধানে 'মগ' শব্দটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে — আরাকানের জাতিবিশেষ। তাহলে আরাকান নামের ভূখণ্ডটিকে আমরা মগের মুলুক বা মগের দেশ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। অবশ্য পৃথিবীর মানচিত্রে এখন আরাকান নামের কোনো দেশকে খুঁজে পাওয়া যায় না। দেশটি এখন মায়ানমার (পূর্বতন ব্রহ্মদেশ বা বার্মা) নামের একটি রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হিসাবে 'রাখাইন স্টেট' নামে চিহ্নিত। এই রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আজ দেশহারা বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা এখন আরাকানকে মায়ানমারের অবিচ্ছেদ্য অংশ রাখাইন হিসাবে চিনলেও এই ভূখণ্ডটির রয়েছে একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। এমনকি বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসেও এই দেশের রাজসভায় লিখিত সাহিত্যের অনস্বীকার্য স্বীকৃতি লক্ষ করা যায়।

আরাকান, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি ভূখণ্ড। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকানের মাঝে বয়ে চলেছে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ ও এক থেকে দেড় কিমি প্রস্থ বিশিষ্ট খরস্রোতা নাফ (Naf) নদী। এই নদীর মাঝ বরারব রয়েছে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের আন্তর্জাতিক সীমারেখা। আরাকানের পূর্ব সীমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আকাশছোঁয়া ইয়োমা (Yoma) পর্বতশ্রেণি। এই পর্বতশ্রেণিই বহুদিন মায়ানমারের হস্তক্ষেপ থেকে আরাকানকে রক্ষা করেছে। অন্যদিকে নাফ নদী বা পাহাড়জঙ্গলে ঘেরা দুর্গম অঞ্চল আরাকান ও চট্টগ্রামের বাসিন্দাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মিলনকে আটকাতে পারেনি। ফলে অচিরেই চট্টগ্রামের অস্ট্রিক বা নিষাদ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আরাকানের ভোটাচিনিয় বা কিরাত জনগোষ্ঠীর অম্লমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই যে মায়ানমার ও বাংলার মূল ভূখণ্ড থেকে দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা তা আরাকানের স্বাধীন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত অবকাশ দিয়েছে।

আরাকানের রাজাবলি

আরাকানের রাজাদের সম্পর্কে অনেক তথ্যই পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আকরগ্রন্থ হল — *রাজোয়াং* যা আসলে আরাকানের রাজবিবরণী। এই গ্রন্থ জানাচ্ছে, ১৪৬ বা ১৫১ খ্রিস্টাব্দে মগধের এক সামন্ত লোকলস্কর নিয়ে আরাকানে পৌঁছে সেখানকার রাজা হয়ে বসেন। তিনি যুগপৎ হিন্দু ও বৌদ্ধ মতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর হাত ধরেই আরাকানের প্রকৃতি-পূজক বাসিন্দারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সন্ধান পায়। প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে এই রাজবংশ 'চন্দ্রসূর্য বংশ' নামে পরিচিতি পায়। ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশের ২৫ জন রাজা আরাকান শাসন করে গেছেন। রাজা মহতইঙ্গ ৎচন্দয় (Mahatoing Tsandaya) ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দেই চন্দ্রবংশের সূচনা করেন। ৯৫১ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রবংশের সুলতইঙ্গ ৎচন্দয় (Sulataing Tsandaya) বঙ্গজয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে 'চেত্তোগৌ' দখল করেন। এই চেত্তোগৌ শব্দ থেকেই চট্টগ্রাম শব্দটি এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। এই বংশের ১২ জন রাজা ১০১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানকে অরাজকতা থেকে রক্ষা করে গেছেন। অতঃপর পেরিন, কিরিত ইত্যাদি বংশের শাসন পেরিয়ে আরাকান পৌঁছায় ম্রাউক উ (Mrauk u) রাজবংশের শাসনে। তাদের রাজধানী ছিল — ম্রোহং (Mrohong)। এই বংশ ১৪৩০ থেকে ১৬৮৪ পর্যন্ত আরাকানকে এক ঐক্যবদ্ধ শাসনে বেঁধে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে। এই রাজবংশের আমলেই আরাকান

রাজসভায় পরম মমতায় চর্চিত হয়েছে বাংলা ভাষা। দৌলত কাজী লিখে গেছেন 'সতী ময়না' বা 'লোরচন্দ্রানী' কাব্য; সৈয়দ আলাওল লিখে গেছেন 'পদ্মাবতী কাব্য'। আর একটি তথ্য উল্লেখ করতেই হয় ম্রাউক-উ বংশের রাজারা ধর্মমতে বৌদ্ধ হলেও তাঁরা ইসলামি আদবকায়দা ও সংস্কৃতির অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তাঁরা আরাকানি নামের পাশাপাশি একটি করে আরবি নামও গ্রহণ করতেন। মুদ্রার একপিঠে ফারসি ভাষায় ইসলামি কলেমা ছাপানোরও ব্যবস্থা করেন তাঁরা। এসবই প্রকৃত পক্ষে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক পদক্ষেপ। আরাকানরাজ নরমিখল (১৪০৪-১৪৩৪) এমন প্রথার প্রচলন করেছিলেন। তিনি অননথিউ নামের এক সামন্তপ্রভুর বোনকে বলপূর্বক বিয়ে করে প্রতিবেশি রাজাদের প্রতিরোধ ও আক্রমণের মুখে পড়ে দেশত্যাগ করে গৌড়ের সুলতানদের আশ্রয়ে চব্বিশ বছর অতিবাহিত করেন। শেষমেষ গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দীন মোহাম্মদ শাহের প্রত্যক্ষ সহায়তায় আরাকানের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এই দীর্ঘ সময় গৌড়ে থাকার ফলে তিনি বাংলাভাষা ও ইসলামের গভীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তবে কৃষ্টি-সংস্কৃতি চর্চায় সুনাম অর্জিত হলেও এই রাজবংশের আমলেই আরাকানরাজাদের প্রতক্ষ-পরোক্ষ মদতে বাংলায় মগ-ফিরিঙ্গির দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছিল এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

রখইঙ্গ > আরাকান > রোসাঙ্গ

আরাকান, এই ভূখণ্ডটির তুলনামূলক অর্বাচীন নাম; আদি নাম রখইঙ্গ (Rakhaing)। শব্দটি সংস্কৃত 'রক্ষ' শব্দের অনুষঙ্গে সৃষ্ট। ভারতের ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ সংস্কৃতি এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নিগ্রোয়েড জনগোষ্ঠীকে রক্ষ বা যক্ষ নামে চিহ্নিত করেছে। যদিও এই আদিম গোষ্ঠীর তেমন কোনো নিদর্শন বা সন্ধান আরাকানে পাওয়া যায়নি। ফলে বাস্তবত ভোট-চিনিয়রাই আরাকানের আদি নৃ-গোষ্ঠীর দাবিদার। প্রত্যক্ষ বৌদ্ধ শাসনে এসে এদেশের ভোট-চিনিয় তথা কিরাত গোষ্ঠীর মানুষ গর্বের সঙ্গে নিজেদের দেশকে রখইঙ্গ তইঙ্গি (Rakhaing tainggyi) বা রাক্ষসভূমি নাম দিয়েছে। আরাকানের রঙ্গমঞ্চে আরবদের আবির্ভাব ঘটে খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর শেষের দিকে। তখন সেখানে রাজত্ব করছিলেন রাজা মহতইঙ্গ ৎচন্দয় (৭৮৮-৮১০ খ্রিস্টাব্দ)। আরব বণিকদের একটি জাহাজ রামব্রী (Rambree) দ্বীপের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারা ওই দ্বীপে আশ্রয় নেয়। পরে রাজার অনুমতি পেয়ে তারা আরাকানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কেউ কেউ মনে করেন তারাই আরবি শব্দ 'আল-রুকুন' (Al-rukun) এর বহুবচন 'আরাকান' (Arakan) শব্দটিকে দেশটির নাম হিসাবে বেছে নিয়েছিল। 'আল-রুকুন' শব্দের অর্থ 'স্তম্ভ'। সেই অর্থে 'আরাকান' শব্দের অর্থ 'স্তম্ভগুলি'। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ— ইমান, নমাজ, রোজা, হজ ও জাকাত স্মরণে রাখার জন্যই তারা দেশটিকে এমন নাম দিয়েছিল বলে মনে করা হয়। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে পর্তুগিজরা এদেশের জলপথে ঘাঁটি গড়ে তোলে। কেউ কেউ মনে করেন তাদের মুখে উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে 'রখইঙ্গ' শব্দটি 'আরাকান' হিসাবে উচ্চারিত হতে থাকে। আরাকানের অন্য একটি নাম পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভায় আশ্রিত বাঙালি কবি দৌলত কাজি, আলাওল প্রমুখের কাব্যে দেশটির নাম হয়েছে – 'রোসাঙ্গ'। সম্ভবত 'রখইঙ্গ' শব্দটিকে তাঁরা 'রোসাঙ্গ' হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

মগ, ফিরিঙ্গি, হার্মাদ, বোম্বেটে : ব্যুৎপত্তি নির্ণয়

বাঙালি বা ভারতীয়রা আরাকানের বৌদ্ধবাসিন্দাদের মগ হিসাবে চিহ্নিত করলেও তারা নিজেরা জানেই না যে প্রতিবেশী দেশ তাদের এমন নামে চেনে। সুপ্রাচীন কাল থেকে আরাকানি বৌদ্ধরা নিজেদের 'রখইঙ্গ' শব্দের অনুষঙ্গে 'রাখাইন' জাতি হিসাবে জানে। অথচ ইতিহাসের পরিহাসে তারাই মগ জাতি নামে পরিচিত হল। 'ভারতকোষ' (৫ম খণ্ড) থেকে জানা যায় বর্মীদের একটি ধর্মীয় উপাধি 'মঙ'। 'মগ' শব্দটির উৎস হিসাবে অনেকে এই 'মঙ' শব্দটিকে চিহ্নিত করে থাকেন। অধ্যাপক D G E Hall মনে করেছেন 'মঙ্গোলয়েড' শব্দ থেকেই 'মগ' শব্দ উদ্ভূত হয়েছে। যুক্তি হিসাবে তিনি আরাকানের আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে মঙ্গোলয়েডদের চেহারার সাদৃশ্যকে তুলে ধরেছেন। Dr F Buchanan ও Sir Willam Hunter ক্ষেত্রসমীক্ষা ও *রাজোয়াং* থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলেছেন – আরাকান ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের পূর্বপুরুষেরা বিহারের মগধ থেকে আরাকানে গিয়েছিলেন বলেই 'মগধ' শব্দের খণ্ডিতরূপ 'মগ' হিসাবে তারা পরিচিতি পেয়েছে। উৎস যাই হোক না কেন 'মগ' একটি নেতিবাচক শব্দ হিসাবে বাংলার জনসমাজে টিকে রয়েছে। 'মগ' শব্দের দোসর হিসাবে 'ফিরিঙ্গি' শব্দটিও বাংলার সমাজ-সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে। আরব-পারস্যের লোকেরা ফ্রান্সের খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধাদের 'ফ্রাঙ্ক' এবং 'ফেরঙ্গ' নামে চিনত। আরাকানের আরবরা ও পর্তুগিজদের এই নামেই চিহ্নিত করতে থাকে। এইভাবে ফিরিঙ্গি শব্দটি বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে স্থান পায়। কেবল ফিরিঙ্গি নয় কালক্রমে পর্তুগিজরা আমাদের দেশের মানুষের কাছে 'হার্মাদ' ও 'বোম্বেটে' নামে ত্রাসসঞ্চারী হয়ে ওঠে। 'হার্মাদ' শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ শব্দ 'আর্মাডা' (Armada) থেকে যার অর্থ যুদ্ধজাহাজ। পর্তুগিজদের মুখে উচ্চারিত শব্দটি এদেশের মানুষের মুখে হারামদ বা হারামাদ এবং শেষমেষ হার্মাদ হিসাবে ধ্বনিত হয়। একসময় শব্দটি মগ শব্দের মতো জলদস্যু অর্থে পরিচিতি পায়। আর এখন তো শব্দটি রাজনৈতিক গুন্ডা অর্থেও ব্যবহৃত হচ্ছে। 'বোম্বেটে' শব্দটির উৎস 'বম্বে' (বর্তমান মুম্বাই) নামক নগরনাম। পর্তুগিজরা যেহেতু বম্বে থেকেই বাংলায় অভিযান করেছিল তাই বম্বে থেকে আগত অর্থে তারা বোম্বাটিয়া বা বোম্বেটে নাম পেয়েছে। আবার পর্তুগিজদের মুখে শোনা 'বোম্বারডেইরো' (Bombardeiro) শব্দ থেকেও বাঙালি এমন শব্দ বানাতে পারে।

মগ-ফিরিঙ্গি যুগলবন্দি

আরাকানের রাখাইন জনগোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেও তাদের অনেকেই বোধহয় বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি অহিংস নীতিকে আত্মস্থ করতে পারেনি বা আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণে এই সমুন্নত আদর্শ তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আরাকানের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় বঙ্গোপসাগরের অবস্থান এবং দেশটিতে নাফ (Naf), মায়ু (Mayu), লেম্বু (Lembru), তানগু (Tangup), কালাদান (Kaladan) ইত্যাদি নদী শিরা-উপশিরার মতো প্রবাহিত হওয়ায় আরাকানিরা স্বাভাবিকভাবেই ছিল নৌ-পারদর্শী জাতি। আরাকানরাজ বচৌপিউ (Basawpu) ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে পাকাপাকিভাবে চট্টগ্রাম দখল করলে আরাকানের মগেরা চট্টগ্রাম বন্দর অঞ্চলে বাণিজ্যে মন দেয়। আবার কেউ কেউ জলপথে দস্যুবৃত্তির পেশা বেছে নিয়ে উপকূলবর্তী বাংলায় পাড়ি জমায়। নদী-লাগোয়া অরক্ষিত গ্রামে সংঘটিত হয় তাদের বর্বর হামলা। কালক্রমে বাঙালির কাছে তারা মগ জলদস্যু হিসাবে কুখ্যাতি কুড়োয়। পরবর্তী কালে পর্তুগিজ জলদস্যু তথা হার্মাদদের সঙ্গে আঁতাত করে তারা বঙ্গের

উপকূলভূমি ও দ্বীপগুলিকে শ্মশানে পরিণত করে। এই যে মগ-ফিরিঙ্গি আঁতাত এর একটা ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। বাংলার বন্দর হিসাবে চট্টগ্রামের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সুদূর ইউরোপেও। আরাকান রাজারা তাই যে-কোনো প্রকারে চট্টগ্রামকে নিজেদের করায়ত্ত রাখতে চেয়েছে। আবার চট্টগ্রাম, আরাকান, বাংলা ও ত্রিপুরার সীমানায় অবস্থিত হওয়ায় অঞ্চলটিকে দখলে রাখার জন্য এই তিন রাজ্যের মধ্যে লড়াই জারি ছিল দীর্ঘকাল। এর মধ্যে আবির্ভাব ঘটে পর্তুগিজদের। বস্তুতপক্ষে ১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম দখল করার আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের কক্সবাজার, রামু ও চট্টগ্রাম দীর্ঘকাল আরাকানের শাসনে থেকেছে।

১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হুসেন শাহের আমলে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের প্রচেষ্টা নেয়। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর পরেও বেশ কয়েকবার তাদের বাণিজ্যতরি চট্টগ্রাম বন্দরের কাছে পৌঁছেও উদ্দেশ্যে হাসিল করতে সফল হয়নি। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাদের হাতে আসে সুবর্ণসুযোগ। সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ, শের শাহের আক্রমণের হাত থকে বাঁচার জন্য পর্তুগিজদের সঙ্গে একটি চুক্তি করে বসেন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে এবং হুগলির সপ্তগ্রামে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ, কর আদায় ইত্যাদি সুবিধা পায়। কিন্তু ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শের শাহ বাংলা জয় করলে পর্তুগিজরা তাদের অধিকার হারায়। সুযোগ বুঝে আরাকানরাজ মেঙ বেঙ (Meng beng) পুনরায় চট্টগ্রাম দখল করে নেন। চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব হারিয়ে পর্তুগিজদের পক্ষে ডাচ, ফরাসি বা ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে তারা হুগলির সপ্তগ্রামে কেন্দ্রীভূত হয়। বাঁচার জন্য তাদের কেউ কেউ আরাকান রাজার সেনাবাহিনীতে নাম লেখায়, কেউ কেউ বেছে নেয় দস্যুবৃত্তির কাজ। বম্বে বা গোয়ার ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত দুরাচারী পর্তুগিজদের গন্তব্য হয়ে ওঠে চট্টগ্রাম ও আরাকান সন্নিহিত অঞ্চল। কেউ কেউ বেছে নেয় সপ্তগ্রামকে। আকবরের আমলে সপ্তগ্রামের নাম হয়ে যায় 'বুলখক খানা' অর্থাৎ বিদ্রোহীদের ঘাঁটি। এখানে জড়ো হত মুঘল বিরোধী বিদ্রোহীরা। আর পর্তুগিজরা এদের ভিতর থেকে বাছাই করা লোকদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের দলে টানত।

আরাকানের বৌদ্ধ বা মগদের সঙ্গে পর্তুগিজদের সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্বমধুর। কখনও এরা একযোগে দস্যুবৃত্তি করেছে বা মোগল-পাঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আবার কখনও লড়েছে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দ্বীপ বা বন্দরের অধিকার নিয়ে। আসলে আরাকানের রাজারা তাঁদের উপকূল অঞ্চলকে বাংলার সুলতানদের বা মুঘলদের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রথম দিকে পর্তুগিজদের সঙ্গে আঁতাতের পথই বেছে নিয়েছিল। কিন্তু পরে বুঝেছিল তাঁদের এই সিদ্ধান্ত ভয়ানক পরিণাম ডেকে আনবে। তখন তাঁরা আরাকানের সীমানা থেকে পর্তুগিজদের সরানোর জন্য যারপরনাই তৎপরতা দেখান। কিন্তু ততদিনে পর্তুগিজরা পায়ের তলার মাটি পেয়ে গেছে। বাংলার বারো ভুঁইয়ার অন্যতম কেদার রায়ের সহযোগিতায় পর্তুগিজ যোদ্ধা কার্ভালো (Carvalho) 'সন্দ্বীপ' নামের বিখ্যাত দ্বীপ বন্দরটি দখল করে নেন। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে মেঘনা নদীর মুখে অবস্থিত এই বাণিজ্য বন্দরের দূরত্ব ছিল চট্টগ্রাম থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যে। এই অবস্থানগত গুরুত্বের জন্য মগ-মোগল-পর্তুগিজ ও ভুঁইয়া কেদার রায় সকলের দৃষ্টি ছিল সন্দ্বীপের উপর। পর্তুগিজ সেনাপতি কার্ভালোকে দমনের জন্য আরাকানরাজ মেঙ-রাদজা-গ্যি (Meng-Radza-gyl) ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে দেড়শো রণতরি পাঠান। কেদার রায়ও পর্তুগিজদের সাহায্যার্থে প্রায় সমসংখ্যক রণতরি পাঠিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। ভয়ানক যুদ্ধে পর্তুগিজরাই জয়লাভ করে।

আরাকানরাজ দ্বিতীয়বার রণতরি পাঠিয়েও পরাস্ত হন। যুদ্ধে জিতেও কার্ভালো বুঝতে পারেন সন্দ্বীপের অধিকার ছাড়তেই হবে। কারণ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সামাল দেওয়া তাঁর পক্ষেসম্ভব ছিল না। তার উপর ছিল বিরূপ আবহাওয়া। তিনি কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরে আশ্রয় নেন। অরক্ষিত সন্দ্বীপের মালিকানা চলে যায় আরকানের রাজার হাতে। চন্দ্রদীপও আরাকানের দখলে চলে আসে। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সেনাপতি মানসিংহ, মন্দা রায়ের নেতৃত্বে নৌবহর পাঠিয়ে কেদার রায়কে পরাস্ত করার পাশাপাশি মগদের হাত থেকে সন্দ্বীপ মুক্ত করে ফতে খাঁর হাতে দায়িত্বভার তুলে দেন। কার্ভালো, যশোরের বিখ্যাত ভূঁইয়া প্রতাপাদিত্যের শরণাপন্ন হলে, প্রতাপ বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে ইসলাম খাঁ, পাঠান ও মগ-ফিরিঙ্গি হামলা রোখার জন্য বিহারের রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। তিনি বাহিনীকে কড়া হাতে মগ-ফিরিঙ্গি দমনের নির্দেশ দেন। সন্দ্বীপের ফৌজদার ফতে খাঁ, ফিরিঙ্গি দেখামাত্র হত্যার ফতোয়া দিলে সেবাস্টিয়ান গঞ্জালেস (Sebastien Gonzales) নামের এক পর্তুগিজ নাবিক, প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাঁকে কেন্দ্র করে পর্তুগিজরা আবার সন্দ্বীপ দখলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। গঞ্জালেসের প্রতিরোধের মুখে পড়ে ফতে খাঁ প্রাণ হারান। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে গঞ্জালেস চারশো পর্তুগিজ যোদ্ধা নিয়ে সন্দ্বীপ দখল করেন। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে আরাকানরাজ মেঙ-রাদজা-গ্যি, গঞ্জালেসের সঙ্গে চুক্তি করে বাংলায় অভিযান চালিয়ে লক্ষ্মীপুর ও ভুলুয়া অধিকার করে নেন। ইসলাম খাঁ, আরাকানরাজের এই স্পর্ধার যথোচিত জবাব দেওয়ার জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে মগ-ফিরিঙ্গি উৎখাতে নেমে পড়েন। মুঘল সৈন্যের আক্রমণের মুখে মেঙ-রাদজা-গ্যি, গঞ্জালেসের বাহিনীকে ফেলে আরাকানে পালিয়ে যান।

১৬১৩ সালে ইসলাম খাঁ-র মৃত্যুর পরে অনভিজ্ঞ কাসেম খাঁ সুবাদার হলে আবার মগ-ফিরিঙ্গি উৎপাত শুরু হয়। এই ফাঁকে আরাকানরাজের বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দেওয়ার জন্য গঞ্জালেস আরাকান জয়ের পরিকল্পনা করেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ১৬১৫-র অক্টোবর মাসে গোয়া থেকে ডন ফ্রান্সিস ১৬টি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে চট্টগ্রামে চলে আসেন। আরাকানরাজ বিপদ বুঝে ডাচদের সঙ্গে চুক্তি করে মিলিত বাহিনী নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। নভেম্বর মাসে গঞ্জালেস আরও পঞ্চাশটি জাহাজ নিয়ে হাজির হন। কিন্তু এবারের যুদ্ধে ফ্রান্সিস মারা গেলে পর্যুদস্ত গঞ্জালেস আরাকান জয়ের দুরাশা ত্যাগ করেন। মগেরা আবার সন্দ্বীপ দখল করে নেয়। এবার মগেরা একচ্ছত্রাধিপতি হয়ে দক্ষিণ বঙ্গে শুরু করে নারকীয় তান্ডব। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গিরের নির্দেশে কাসেম খাঁ, মগ উৎখাতে বদ্ধ পরিকর হয়ে ৫০০০ অশ্বারোহী বাহিনী, ৫০০০ বন্দুকবাজ, ২০০ হস্তিবাহিনী ও ১০০ যুদ্ধজাহাজ নিয়ে চট্টগ্রাম অভিযান করেন। কিন্তু মগ-বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণ ও গোলার মুখে পড়ে অচিরেই মোগল বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে কাসেম খাঁ-কে সরিয়ে বাংলার সুবাদার হিসাবে ইব্রাহিম খাঁ-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে আরাকানরাজ মেঙ খামাউং (Meng Khamaung) সন্দ্বীপ দখলের আনন্দে ডগমগ হয়ে ৭০০ ঘুরব (Ghurob) ও ৪০০০ জেলিয়া (Jelia) রণতরি নিয়ে মেঘনা তীরবর্তী অঞ্চলে হামলা চালান। কোনোরকম প্রতিরোধ না-থাকায় প্রবল উৎসাহে তিনি ঢাকার কাছাকাছি বাঘচরের দিকে অগ্রসর হন। অসমসাহসী ইব্রাহিম খাঁ, মাত্র ৩২টি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে বাঘচরের দিকে এগিয়ে যান। পরে অবশ্য মনসবদার ও জমিদারদের উদ্যোগে ৮০০০ অশ্বারোহী বাহিনী ও ৫০০০ যুদ্ধজাহাজ একত্রিত

হলে আরাকানরাজ রণে ভঙ্গ দেন। এইভাবে ইব্রাহিম খাঁ-র পাঁচ বছরের শাসনে বাংলায় শান্তি ফিরে আসে, মগ-ফিরিঙ্গির উৎপাত অনেকটাই থেমে যায়।

ফিরিঙ্গি-নিধন পালা

১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে শাজাহান, সিংহাসনের দাবিতে জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। দাক্ষিণাত্যে সুবিধা করতে না-পেরে তিনি উড়িষ্যার দিক থেকে বাংলায় ঢুকে বর্ধমান জয় করে নেন। এই খবর জানার পর হুগলির পর্তুগিজ অধ্যক্ষ রড্রিগো (Rodrigo) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শাহাজান তাঁর কাছে কয়েকটি কামান ও গোলন্দাজ সেনা চেয়ে বসেন। কিন্তু বিবেচক রড্রিগো তাঁর এই প্রার্থনা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। ইব্রাহিম খাঁ শাজাহানকে আটকানোর জন্য মগ-দমনে নিযুক্ত সৈন্যদের সরিয়ে আনলে আবার মগ জলদস্যুদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। ইব্রাহিম খাঁ-র পক্ষে শাজাহানের বাহিনীর মোকাবিলা করা সম্ভব না-হলেও প্রাণের বিনিময়ে তিনি জাহাঙ্গিরের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ রেখে যান। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে বসে শাজাহান কাসেম খাঁ জোয়ানিকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। কাসেম খাঁ বাংলার দায়িত্ব পেয়ে পর্তুগিজ দমনের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। সম্ভবত শাজাহান পর্তুগিজ সেনানায়ক রড্রিগোর অসহযোগিতার ঘটনাটির স্মৃতিতাড়িত হয়ে কাসেম খাঁ-কে এমন নির্দেশ দিয়ে থাকবেন।

পর্তুগিজরা আরাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে হুগলিতে গির্জা ও কুঠি বানিয়ে বসবাস করছিল। বসবাসের স্থানকে তারা ব্যান্ডেল বলত। হুগলির ব্যান্ডেলকে তারা ক্রমে দুর্গে রূপান্তরিত করে। মূলত নুন ও বস্ত্র ব্যবসায় যুক্ত থাকলেও তারা দস্যুবৃত্তি একেবারে ছাড়তে পারেনি। এমনকি তারা নরনারী কেনাবেচার মতো অমানবিক কাজেও লিপ্ত ছিল। তাদের ব্যান্ডেল-সন্নিহিত অঞ্চল দিয়ে কোনো বাণিজ্যতরি চলাচল করলে তারা বলপূর্বক তাদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করত, কখনও কখনও লুঠপাট ও চালাত। কাসেম খাঁ বুঝেছিলেন যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে পর্তুগিজদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামলে বেগ পেতে হবে। তারা গোয়ায় খবর পাঠিয়ে সেখান থেকে সৈন্য আনার কথা ভাবতে পারে। তাই তিনি চতুরতার সঙ্গে জমিদারদের দমন করার কথা প্রচার করে তিনটি দলে ভাগ করে বাহিনী পাঠান। একদল সেনা শ্রীরামপুরের কাছে নদীতে নিশ্ছিদ্র পাহারার মাধ্যমে পর্তুগিজদের প্রস্থানের পথ রোধ করে। বাকি দুটি দল পর্তুগিজদের দুর্গ ঘিরে ফেলে। তিনমাস এই অবরোধ চলে। শেষমেশ দুর্গের পাঁচিলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মোগল বাহিনী দুর্গে প্রবেশ করে। যুদ্ধে পর্তুগিজদের শতাধিক যুদ্ধজাহাজও অন্যান্য জলযান ধ্বংস হয়। প্রাণ হারায় প্রায় এক হাজার নরনারী। পাঁচ হাজারের মতো পর্তুগিজ বন্দি হলে তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। এদের মধ্যে সুন্দরী যুবতীরা বাদশাহের ও অন্যান্য পদস্থদের হারেমে স্থান পায়। কয়েক দশক আগে আরাকান-চট্টগ্রাম সন্নিহিত অঞ্চলে যে পর্তুগিজ উত্থান-পালা শুরু হয়েছিল তার শেষ দৃশ্য এমনই মর্মান্তিকভাবে অভিনীত হয় হুগলির ব্যান্ডেলে।

অথ মগ-সংহার পালা অথবা নেমেসিস কবলিত শাহ সুজা

১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে শাজাহানের তৃতীয় পুত্র সুজা বাংলার সুবাদার হন। তিনি ঢাকা থেকে বিহারের রাজমহলে পুনরায় রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে যান। প্রভূত অর্থ ব্যয় করে রাজমহলের পূর্বতন প্রাসাদটিকে

বসবাসযোগ্য করে তোলেন। ভয়ংকর এক অগ্নিকাণ্ড ও গঙ্গার ভাঙন সামাল দিয়ে তিনি যখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন ঠিক তখনই দিল্লির দরবারি চক্রান্তে তাঁকে শাসকপদ নিয়ে আফগানিস্তানে বদলি হতে হয়। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে শাহাজাহান ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়লে জ্যেষ্ঠপুত্র দারা মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনভার নিজের কাঁধেই তুলে নেন। সংবাদ পেয়ে সুজা দিল্লির দিকে অগ্রসর হন। বারাণসীতে তিনি দারার পুত্র সুলেমানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হন। দিল্লির সিংহাসনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতি সুজার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দিল্লির মসনদে বসার স্বপ্নে বিভোর আওরঙ্গজেব সুজাকে সায়েস্তা করার জন্য বেরিয়ে পড়েন। সুজা, খাজোয়ার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হন। অতঃপর আওরঙ্গজেব, সেনাপতি মীর জুমলার উপর সুজাকে দমনের দায়িত্ব দেন। মীর জুমলার তাড়া খেয়ে সুজা প্রথমে ঢাকা এবং সেখান থেকে আরাকানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। যদিও তাঁর চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল মক্কা, তবুও খারাপ আবহাওয়ার জন্য তাঁকে আরাকানরাজ সান্দ থু ধম্মা (Sanda Thu-dhomma) বা চন্দ্র সুধর্মার আতিথেয়তা গ্রহণ করতে হয়। আশ্রয়দাতা রাজা একদা শাহ সুজার এক কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। সুজা এই প্রস্তাব সক্রোধে প্রত্যাখান করেন। অতঃপর আরাকানরাজের নির্দেশে সুজা সপরিবারে নিহত হন। এই ঘটনার সঙ্গে মীর জুমলার যোগ থাকার কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। মীর জুমলার সঙ্গে চক্রান্ত করেই নাকি আরাকানরাজ এমন ঘটনা ঘটিয়ে ছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে আরাকানে বৌদ্ধ-মগ ও আরাকানি মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়।

একদা সিংহাসনের দাবিদার হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেও সুজার এই নির্মম পরিণতি আওরঙ্গজেবকে ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত করে তোলে। তিনি ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ-কে বাংলার সুবাদার পদে নিয়োগ করে বাংলা থেকে মগেদের সমূলে বিনাশ করার নির্দেশ দেন। বিচক্ষণ শায়েস্তা খাঁ বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পর্তুগিজ নাবিক ও যোদ্ধাদের ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে মোগল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ১৬৬৫-র ২৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম অভিমুখে মোগল বাহিনী অগ্রসর হয়। সন্দ্বীপের মোগল শাসক দিলওয়ার খাঁ, মগেদের সঙ্গে আঁতাত করে স্বাধীন সামন্তের মতো স্বাধীনতা ভোগ করছিলেন। শায়েস্তা খাঁ, সন্দ্বীপ দখল করে দিলওয়ার খাঁ-কে বন্দি করেন। সন্দ্বীপ থেকে বাহিনী চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়। কর্ণফুলি নদীর মোহনায় মগ-মোগলের লড়াই বেধে যায়। মগ বাহিনীর বহু রণতরি ধ্বংস হয়, তাদের ১৩৫টি জলযান মোগল বাহিনী অধিকার করে নেয়। ভয়ংকর যুদ্ধের শেষে মোগল বাহিনী চট্টগ্রাম দুর্গ জয় করে। দুর্গ থেকে লোহা ও পিতলের তৈরি ১০২৬ টি কামান ও অনেকগুলি বন্দুক মোগল বাহিনীর হস্তগত হয়।

মগ ফিরিঙ্গি দুরাচার

প্রায় দুশো বছর উপকূলবর্তী বাংলা, মগ-ফিরিঙ্গির দুরাচার সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। হত্যা-ধর্ষণ-লুঠতরাজ, এমনকি মানুষকে বন্দি করে বিক্রি করার মতো জঘন্য পাশবিকতা ও তারা অবলীলায় সংঘটিত করেছে। নদী সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রাম-গঞ্জ ছিল মগ-ফিরিঙ্গিদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। বিশেষত উৎসব-অনুষ্ঠানের দিনগুলোকে তারা বেছে নিত। হত্যা, ধর্ষণ বা লুণ্ঠনের পর তারা অকুস্থলে আগুন ধরিয়ে দিত। মগ-ফিরিঙ্গি অত্যাচারের এমন সব জীবন্ত ছবি পাওয়া যায় সেই সময়ের বিদেশি পর্যটক বা ঐতিহাসিকদের রচনায়। রমেশচন্দ্র মজুমদারের *বাংলাদেশের ইতিহাস*

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে জানা যায়, ১৬২১ থেকে ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মগ-ফিরিঙ্গিরা বিয়াল্লিশ হাজার নরনারীকে বঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে বন্দি করে চট্টগ্রামে নিয়ে যায়।

পর্তুগিজ পাদ্রি সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক (Sebastien Mannique) খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ১৬২৯ থেকে ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামের দেয়াং ও আঙ্গারখালিতে ছিলেন। তাঁর লেখায় তৎকালীন চট্টগ্রামে মগ-ফিরিঙ্গিদের বীভৎস নিপীড়নের ছবি ধরা আছে। আশ্চর্যের কথা এই যে তিনি এইসব অত্যাচারের কথা নির্লিপ্তি সহকারে বর্ণনা করে গেছেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছে বন্দিদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা একটি মহৎ কর্ম, এই কাজের দ্বারা তিনি তাদের অন্ধবিশ্বাসের জগৎ থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের আলোকিত জগতে পৌঁছে দিচ্ছেন। আর তাদের এই পীড়ন সুদিনে পৌঁছানোর সোপানমাত্র। তাঁর লেখা থেকে একটু উদ্ধৃতি নেওয়া যাক –'There was religious zeal to enslave people and convert them to christianity. Their abduction, ruin and enslavement , degradation were spiritually an extra-ordinary piece of good fortune' ম্যানরিকের ধর্মান্তরকরণের একটি পরিসংখ্যানও পাওয়া যায় – 'On the average 3,400 persons were kidnapped annually and brought to Dianga (দেয়াং)।' এদের মধ্যে প্রায় ২০০০ জনকে তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে আলোকিত ভুবনে পৌঁছে দিতেন।

ফরাসি চিকিৎসক ফ্রান্সিস বার্নিয়ের ১৬৫৯ সালে ভারতে আসেন। তিনি বাংলার সুন্দরবনেও এসেছিলেন। 'Travels of the Mughal Empier' বইতে তিনি ভারতভ্রমণের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, মগদের হানাদারিতে নিম্নবঙ্গের বহু গ্রাম ও সুন্দরবনের বহু জনপদ জনশূন্য হয়ে পড়েছিল, সেখানে বাঘ ও অন্যান্য বন্যজন্তুদের আবাস গড়ে উঠেছিল। মগ-ফিরিঙ্গির অত্যাচারের রোমহর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক শিহাবউদ্দিন তালিশ-এর লেখা *ফতিয়া ই ইবরিয়া* গ্রন্থে। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার প্রবাসী (৫ম ভাগ, ৯ম সংখ্যা ১৩১২ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদ থেকে আমরা তালিশের বর্ণনা দেখে নেব – 'আরাকান হইতে মগ ও ফিরিঙ্গিগণ প্রতি বৎসর বাংলায় ডাকাতি করিতে আসিত। হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, দরিদ্র-ধনী যাহাকে পাইত বন্দী করিত এবং তাহাদের হাতের পাতা ফুটা করিয়া তাহার মধ্যে পাতলা বেত চালাইয়া দিয়া বাঁধিয়া নৌকার পাটাতনের নীচে ফেলিয়া লইয়া যাইত। যেমন খাঁচার মধ্যে মুরগীকে দানা ফেলিয়া দেওয়া হয়, তেমনি এদের জন্য প্রাতে ও সন্ধ্যায় কাঁচা চাউল ফেলিয়া দেওয়া হইত। এ কষ্ট ও অত্যাচারে অনেকে মরিয়া যাইত যে কয়টি শক্তপ্রাণ লোক বাঁচিয়া থাকিত তাহাদের চাষবাস ও অন্যান্য নীচ কাজের জন্য দাসভাবে রাখিত, অথবা ইংরেজ, ফরাসী ও ডাচ বণিকদের নিকট দাক্ষিণাত্যের বন্দরে বেচিয়া ফেলিত।' কেবল যে বিদেশিরা মগ-ফিরিঙ্গিদের দাসব্যবসার ক্রেতা ছিল এমনটা নয়; অনেক সম্পন্ন বাঙালি ক্রেতাও দাসবাজারের নিলামে অংশ নিয়ে নরনারী কিনে নিয়ে যেত। কেউ কেউ দাসবাজার থেকে কেনা মেয়েকে উপপত্নী হিসাবে রাখতেন, কেউ কেউ বিয়েও করতেন।

মগদস্যুদের প্রতিহত করার কথা তৎকালীন উপকূল বাংলার নিরীহ সংস্কার প্রাণ হিন্দুদের ভাবনার অতীত ছিল। শিহাব উদ্দিন তালিশের লেখাতেই পাওয়া যায়, ১০০টি মোগল জাহাজ খান চারেক মগ-ফিরিঙ্গি জাহাজ দেখলে নিঃশব্দে সরে পড়ত এবং নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছতে পারলে নিজেদের বীরত্বের কথা ভেবে গর্ব বোধ করত। কোনোক্রমে তারা যদি মগ-ফিরিঙ্গি জাহাজের নিকটে চলে যেত তখন তারা ভয়ে জাহাজ ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ত। মগ-ফিরিঙ্গিদের হাতে

বন্দি হওয়ার থেকে মৃত্যুই ছিল তাদের অধিকতর পছন্দের। সেনাদের যখন এই অবস্থা তখন অসামরিক লোকজনের কথা না বলাই ভালো। তবে এই বিপর্যয়ের মধ্যেও হিন্দু সমাজপতিরা বিধান দেওয়ার কথা ভোলেননি। তাঁরা মগেদের সংস্পর্শে আসা নরনারীদের পতিত ঘোষণা করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তবুও বর্ণসংকর প্রজন্ম থেকে হিন্দুসমাজ রেহাই পায়নি। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা একটু দেখে নেব – 'মগদস্যুরা পর্তুগীজদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া দেশে যে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অতি ভয়াবহ। তাহাদের স্পর্শদোষে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার এখনও পতিত হইয়া আছেন। বিক্রমপুরের মগ-ব্রাহ্মণদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। মগ ও পর্তুগীজদের ঔরসজাত অনেক সন্তানে এখনও বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ।'

শেষ হয়েও হইল না শেষ

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম মোগল বাহিনীর করায়ত্ত হওয়ার পরেও মাঝেমধ্যে মগ-ফিরিঙ্গির যৌথ বা একক আক্রমণের শিকার হয়েছে বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চল। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আকড়া-বজবজ অঞ্চলে দাসবিক্রির জন্য মগ-ফিরিঙ্গিদের জাহাজ ভেড়ার তথ্য পাওয়া যায়। আবার ১৭১৮ সালের *East India Chronicle*- এ পাওয়া যাচ্ছে – 'Feb 1717, The Mughs carried off from most southern parts of Bengal 1800 men , women and children, in ten days they landed at Arracan and were conducted before the sovereign, who close the handi-craftsmen, about one fourth of their number, as his slaves. The remainder were returned to their captors with ropes about their neck , taken to market , and sold according to their strength from 20 to 70 rupees each ...' তবে এ কথাও ঠিক ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের পরে মগ-ফিরিঙ্গির ধারাবাহিক আক্রমণে ছেদ পড়ে। ক্রমশ বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে এইসব হামলা আরও কিছুকাল টিকে থাকে।

আমাদের গাঙ্গেয় উপকূলে ফিরিঙ্গি অর্থাৎ পর্তুগিজদের মতো মগদের দুর্গ বানানোর বা স্থায়ীভাবে বসবাসের তেমন কোনো পাথুরে প্রমাণ হস্তগত হয়নি। কথিত আছে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে পূর্ব মেদিনীপুরের হিজলি অঞ্চল, মগ-পর্তুগিজ জলদস্যুদের অবাধ লুঠতরাজের কারণে 'মগের মুলুক' হিসাবে কুখ্যাতি পেয়েছিল। আমাদের মনে হয় মগেরা পূর্ববঙ্গের মতো পশ্চিমবঙ্গের নদী সন্নিহিত কোনো কোনো অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করত। এমনও হতে পারে তারা কালক্রমে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে মিশে গেছে আবহমান জনস্রোতে। পর্তুগিজদের ক্ষেত্রে এমন অনেক নজির আমাদের হাতে রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের গেঁওখালির মীরপুরে এখনও বহাল তবিয়তে টিকে আছে পর্তুগিজ পাড়া; যদিও তাদের দেখলে বোঝা মুশকিল তাদের শরীরে পর্তুগিজ রক্ত বহমান। আসলে তারা এখন পুরোদস্তুর বাঙালি। ১৭৪২ সালের দিকে মহিষাদলের রাজা আনন্দলাল জলদস্যুদের হাত থেকে রাজত্ব বাঁচাতে বারোজন পর্তুগিজ সৈন্যকে মীরপুরে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। তারাই এই পাড়ার পর্তুগিজদের উত্তরসূরি। মগদের এমন কোনো কলোনি বা বসতি নির্মাণের হদিশ আমাদের হাতে নেই। মগেরা কি তাদের মঙ্গোলয়েড চেহারার জন্য এদেশের মানুষের সমীহ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিল? অন্যদিকে পর্তুগিজরা তাদের রাজকীয় চেহারার দৌলতে সহজেই এদেশের জনমানসে প্রভুর আসন পেয়েছে? হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। অবশ্য মগেরা যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে জাঁকিয়ে বসেছিল এ বিষয়ে অন্তত আমাদের কোনো

সংশয় নেই। কোনো ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ না দাখিল করেও আমরা পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগরাজপুর নামদুটিকে আশ্রয় করে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি। হয়তো কোনো সময় মগ সেনাপতিদের কেউ কেউ এইসব এলাকায় রাজা সেজে বসে বশীভূত বাঙালিদের সমীহ আদায় করে বাংলার সমাজে বিলীন হয়ে গেছে। এইভাবে বঙ্গীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গি-মোগল-পাঠান মিলেমিশে একাকার হয়ে বাংলার তিলোত্তমা সমাজদেহ নির্মাণ করেছে। তাই হয়তো বাঙালির দৈহিক গঠনে, গাত্রবর্ণে, চুল ও চোখের মণির রঙে এত বৈচিত্র্য; তার সংস্কৃতি এত ঘাতসহ ঋজু ও ঋদ্ধ!

গ্রন্থপঞ্জি :

১. বৃহৎ বঙ্গ, দীনেশচন্দ্র সেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
২. আরাকান রাজসভার বাঙ্গালা সাহিত্য, মুহাম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা।
৩. সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী, সম্পাদনা মযহারুল ইসলাম ও দুলাল চৌধুরী, হরফ প্রকাশনী।
৪. ইতিহাস অনুসন্ধান ১৫, সম্পাদনা গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড।
৫. মধ্যযুগে বাঙ্গলা, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং।
৬. বাংলার বারো ভুঁইয়া ও মহারাজ প্রতাপদিত্য, সম্পাদনা কমল চৌধুরী; দে'জ পাবলিশিং।
৭. বঙ্গ বৃত্তান্ত, অসীমকুমার রায়; ঋদ্ধি ইণ্ডিয়া।
৮. আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস, মাহফুজুর রহমান আখন্দ; বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড।
৯. বাংলা স্থাননাম, সুকুমার সেন; পুস্তক বিপণি।
১০. History of Bengal : Mughal Period, Atul Chandra Roy ; Nababharat Publishers.
১১. Magh Raiders in Bengal, Jmini Mohon Ghosh ; Bookland Private limited
১২. Portuguese in Bengal, J. J. A Campose ; Butterworth & Company .
১৩. Short Historical Background of Arakan, M. A Alam ; Arakan Historical Soceity.
১৪. Buddhim in Myanmar : A Short History, Roger Bischoff ; Buddhist Publication Soceity , Sri Lanka .
১৫. Slavery , Abolitionism and Empire in India, 1712-1843, Andre a Major ; Liverpool University Press

পুস্তক পর্যালোচনা:

দক্ষ এক প্রাবন্ধিকের আত্মপ্রকাশ

অরবিন্দ পুরকাইত

এক ব্যতিক্রমী গদ্যের হাত চন্দন মিত্রের। তাঁর গদ্যের সঙ্গে পরিচিত হই আমরা মূলত প্রবন্ধ ও গল্পের মাধ্যমে। দীর্ঘদিন লেখাজোখার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, মাত্র ইদানীং প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রবন্ধের বই – *জেন: রিপুতাড়িত মানবের নিকট সুসমাচার ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। তাঁর এই প্রবন্ধের বইটির গুরুত্ব সাধ্য অনুযায়ী বুঝতে চাইব আমরা এখানে।

চন্দন মিত্রের প্রবন্ধের প্রধান দিক হল সুনির্বাচিত বিষয়ের প্রতি গভীর মনোযোগ ও পরিশ্রমী যত্নশীলতা। কিংবা 'ট্রিটমেন্ট'। নিজস্ব বোধ এবং অধীত বিদ্যার আলোকে লিখিত তাঁর প্রবন্ধগুলি পড়লে মনে হয় বড় প্রয়োজন ছিল সেগুলির। তার সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর দৃষ্টিকোণ, যা মুক্তমন ও মানবিকতার আন্তরিক স্বাক্ষরবাহী। এক টানটান ঋজু গদ্যে বিষয়ের অঙ্গীভূত করে নেন তিনি পাঠককে। সবচেয়ে যেটা বলতে ইচ্ছা করে, সে গদ্য হল লক্ষ্যভেদী। শ্রী মিত্রের প্রবন্ধে বিষয় অনুযায়ী সচরাচর চমৎকার একটি সূচনা থাকে, থাকে লক্ষ্যভেদী একটি উপসংহার, আর নানা কোণ দিয়ে বিষয়কে দেখতে দেখতে মাঝের ক্রমবিস্তার ও গুটিয়ে-আনার পথটি থাকে বিচার-বিশ্লেষণ পূর্ণ। প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে পাঠক তাই পেয়ে যান সেই বিষয়ে যেন একটি পূর্ণ চিত্র। এইখানেই পাঠকের তৃপ্তি। বেঁধে-দেওয়া শব্দগণ্ডিবা এলোমেলো আলোচনার প্রবণতা সহজে যেখানে পৌঁছাতে অপারগ।

পুস্তকধৃত দশটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রথম দুটি – *বাহান্নর ভাষা আন্দোলন: পটভূমি ও বিস্তার* এবং *বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন: প্রেক্ষাপট ও প্রতিক্রিয়া* – হল বর্তমান বাংলাদেশ ও আসামের বরাক উপত্যকার প্রধান দুই ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে, যাদের সূত্রে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে দুটি তারিখ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে – একুশে ফেব্রুয়ারি ও উনিশে মে। অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে প্রেক্ষাপট ও পরিণতি সহ ফুটে উঠেছে দুই ভাষা আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র। অনবদ্য দুটি লেখা! পড়তে পড়তে বুকের কাছে কখনও কখনও কী যে একটা দলা পাকিয়ে ওঠে, চোখের কোণ করে ওঠে চিকিচিক!

সহজিয়া জীবন ও জগৎ-দর্শন হিসাবে এসেছে *জেন: রিপুতাড়িত মানবের নিকট সুসমাচার* ও *লালনের গান: আমাদের লালিত সংস্কারের গালে সপাট থাপ্পড়* শীর্ষক প্রবন্ধদুটি। রহস্যমণ্ডিত জেনদর্শন, জেন সাধুদের প্রসঙ্গ, হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো 'সাতোরি'-লাভসহ অসাধারণ আকর্ষণীয় কয়েকটি জেন গল্প অনূদিত হয়ে প্রবন্ধটিকে অনন্য এক মর্যাদায় উন্নীত করেছে। জেন ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক লিখেছেন : 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলি ঈশ্বর-আল্লা-গড বা অন্যান্য দেবদেবী ও স্বর্গ-নরকের অস্তিত্বে আস্থাশীল। তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের মুখ্য উদ্দেশ্য মৃত্যুর পরে নরক নামের ভয়ংকর স্থানকে এড়িয়ে স্বর্গ নামের স্ফূর্তিদায়ক সুরম্যস্থানের মৌরসিপাট্টা হাতানো। কিন্তু জেনবাদীদের কাছে এসব হাস্যকর। তাঁরা এইসব অতিপবিত্র ও স্পর্শকাতর ধারণাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে এই নশ্বর জগতের নির্যাস-সন্ধানে ব্রতী।' বোঝা যায়, এমনি এমনি এটি পুস্তকের নাম-প্রবন্ধ হয়নি।

ইহবাদী লোকধর্ম বলাহাড়ি, লোকায়তিক চার্বাক ইত্যাদি ছুঁয়ে লালনে প্রবেশ করে প্রাবন্ধিক

শেষমেষ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার সঙ্গে সহমত পোষণ না করে আমাদের উপায় থাকে না: 'আসলে মৌলবাদ জানে তাকে টিকে থাকতে এবং বিকশিত হতে গেলে গ্রামে-গঞ্জে শিকড় চারিয়ে মানবতাবাদকে আগলে রাখা লালনপন্থাকে সমূলে বিনাশ করতে হবে। কারণ লালনপন্থার যুক্তি ও জীবনচর্যার কাছে মৌলবাদ অসহায়। এমন লড়াই শহুরে ভদ্র-শিক্ষিতজনেরাও দিতে পারেননি। কারণ তাঁদের হারানোর অনেক কিছু আছে বিত্ত, সম্ভ্রম, আভিজাত্য, কৌলীন্য, সামজিক প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য বিবিধ আর্থিক ও পারমার্থিক সম্পদ। তাই তেমন বেকায়দায় পড়লে অথবা স্বার্থ বিঘ্নিত হলে তাঁরা যাবতীয় প্রগতিশীল আদর্শকে লাথি মেরে খাঁটি হিন্দু বা মুসলমান হয়ে উঠতে বিন্দুমাত্র সময় নেন না। এই ভণ্ডামির ছোঁয়াচ থেকে লালনপন্থীরা মুক্ত। আসলে লালনপন্থীদের নিজস্ব আদর্শ 'মানবধর্ম' ছাড়া হারাবার কিছুই নেই। আর সেটা হারিয়ে গেলে তাঁদের অস্তিত্বটাই মিথ্যে হয়ে যায়। তাঁরা হিন্দুও নন, মুসলমানও নন; তাঁরা দুই প্রতাপশালী প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মাঝখানে একটি অকৈতব সাঁকো।'

সাহিত্যতত্ত্বের দিক দিয়ে জাদু-বাস্তবতা বিশ্লেষিত হয়েছে *ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু-বাস্তবতা: স্বরূপ সন্ধান* প্রবন্ধে। বিশেষ সৃষ্টি হিসাবে *উলঙ্গ রাজার গল্প* ও *রবীন্দ্রনাথের গোরা ও ভগিনী নিবেদিতা* প্রবন্ধদুটিতে উঠে এসেছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'উলঙ্গ রাজা' কবিতার প্রেক্ষিতে 'উলঙ্গ রাজা'র উৎসসন্ধান এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' মিলনান্তক হওয়ার পিছনে আইরিশ কন্যা ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা।

আর আছে নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ককে শরীরী আশ্লেষে নামিয়ে-আনা এক প্রাজ্ঞ অধ্যাপকলেখকের রচিত উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের ('ছদ্ম গবেষণাধর্মী') বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ এক প্রতিবাদ *কাদম্বরীর সুইসাইড নোট: নিছক নামমাহাত্ম্যের বেসাতি* শীর্ষক লেখায়। কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার পুরো পটভূমি ও পরিণতি তুলে ধরে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন 'চাতুর্যের সঙ্গে নির্মিত' প্রচ্ছদ ও ব্লার্বসম্বলিত 'অন্তঃসারশূন্য, মলাটসর্বস্ব' একটি বই 'নামমাহাত্ম্যকে সম্বল করে' কীভাবে 'দিনের পর দিন সংস্করণ-বৈতরণী পার হয়ে চলেছে।'

শেষে সাহিত্যিক হিসাবে আলোচনার বৃত্তে উঠে এসেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও মণীন্দ্র গুপ্ত *সিরাজনামা: প্রাজ্ঞ এক মুসাফিরের আখ্যান* ও *মণীন্দ্র গুপ্ত (১৯২৬-২০১৮): মহানগরে এক গ্রামবৃদ্ধ* প্রবন্ধদুটিতে। একাধারে দুই সাহিত্যিকের উৎসপট, ব্যক্তিমানস ও সাহিত্যমানস চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ দুটিতে।

ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার! বানান নির্ভুল। প্রচ্ছদ সুন্দর!

পুস্তক:

জেন: রিপুতাড়িত মানবের নিকট সুসমাচার ও অন্যান্য প্রবন্ধ

লেখক: চন্দন মিত্র

প্রকাশক: কলিকাতা লেটারপ্রেস

প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৯

মূল্য: দুশো টাকা